Health (স্বাস্থ্য)

অ্যালার্জি জনিত সর্দি বা Allergic rhinitis অথবা হে ফিবার ঃ- (নাকের এলার্জি)

PUBLISHED ON *September 14, 2014 by Health (স্বাস্থ্য) -2 Comments*

i
7 Votes

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/09/rhi-1.gif)Aegis Pharmaceuticals merges with Hunter-Fleming Ltd (Int. school of Bristol Med. Uni) , Virology and Immunology support group (UK) – Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology –IACIB (Dhaka) Updated And created by Dr.H.Kamaly) মুল তথ্য আবিস্কারক ঃ ১৮১৯ সালে চিকিসক জন বোস্টক প্রথম হে ফিভার শনাক্ত করেন এবং ১৯০৬ সালে বিজ্ঞানী ক্লোমেনস্ পিরকোয়েট অ্যালার্জির কৌশল আবিষ্কার করেন।)

অ্যালার্জি কি ?

সাধারণত মানুষের শরীর সবসময়ই ক্ষতিকর বস্তুকে (পরজীবী, ছত্রাক, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া) প্রতিরোধের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা করে বা এই প্রচেষ্টাকে রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়া বা ইমিউন বলা হয় কিন্ত কখনো কখনো আমাদের শরীর সাধারণত ক্ষতিকর নয় এমন অনেক ধরনের বস্তুকেও ইমিউন সিস্টেম ক্ষতিকর ভেবে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। অথচ তা ক্ষতিকর নয় এমনসব বস্তুর প্রতি শরীরের এ অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে অ্যালার্জি বলা হয়। অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী বহিরাগত বস্তুগুলোকে অ্যালার্জি উৎপাদক বা অ্যালাজেন বলা হয়। এ সময় প্রতিরোধক এন্টিবডির সাথে একত্রিত হয় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন আরো অনেক রাসায়নিক পদার্থ। এরপর শুরু হয় প্রতিক্রিয়া। সব শেষে প্রতিরোধ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বের হয় হিস্টামিন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থটি বহিরাগত অচেনা বস্তুটিকে নিষ্ক্রিয় এবং নিষ্ক্রান্ত করে, আবার অনেক সময় এই ভয়ানক প্রতিক্রিয়ায় শরীর নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ইহাই অ্যালার্জি ।

অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা নাকের এলার্জি দুই ধরনের ১- সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস ২- পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস

হে ফিভার বা নাকের সর্দির এর কারণ :

বিভিন্ন কারণে এই সংক্রমণ হতে পারে। এর নির্দিষ্ট একক কোন কারণে নেই। এলার্জিক হওয়ায় কারন একেক জনের কাছে একেক রকম কারণে তা হয় । যেমন- ধূলাবালি, ফুলের রেণু, হঠাৎ ঠান্ডা-গরমের মিশ্রণ, অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত ঠান্ডা, আবহাওয়ার পরিবর্তন, সুতার আঁশ, রান্নার গন্ধ, মসল্লার উগ্র খাবারের গন্ধ, এলার্জিক খাবার ইত্যাদি (ব্যক্তি ভেদে একেক জনের নিকট একেক খাদ্য)। ধূলাবালি এবং ফুলের রেণু বিশেষ করে ঘাস ফুলের রেণু থেকে ছড়ানো এলার্জি হে ফিভারের অন্যতম কারণ।
সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস : (ঋতু পরিবর্তনে নাকের সর্দি)
বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় অ্যালার্জিক রাইনাইটিস হলে একে সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়। । এই রোগের কোনো নির্দিষ্ট বয়সসীমা নেই, সকল বয়সের মানুষেরই এ রোগ হয়ে থাকে । । হে ফিভার কোন ক্রণিক রোগ নয়, বরং তৎক্ষণাৎ বা হঠাৎ এই উপসর্গ দেখা দেয়।
ঋতু পরিবর্তনের সময় এ ধরণের উপসর্গ বেশি দেখা যায়। অর্থাৎ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ কোনো ফুল (যেমন- ঘাসফুল বা সজিনা ফুল বা যে কোন ফুলের রেনু) ফুটলে বাতাসের সঙ্গে তার রেণু ভেসে নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে ও অ্যালার্জেন সৃষ্টি করে। সাধারণত ঘাস ফুলের রেণু থেকেই বেশি অ্যালার্জি হয়।সাধারণত গ্রীষ্মের শেষে এবং বর্ষা ও শরতে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।
আগেকার দিনে মনে করা হতো খড় বা পেয়ার থেকে এই রোগের উৎপত্তি । আসলে এই রোগ দেখা দেয় পুষ্পরেণু

থেকে যা শরীরে প্রবেশের সময় রোগ প্রতিরোধমূলক শক্তির একটা প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। কার ও বেলায় চোখ এবং নাকের বাতাস চলাচলের রাস্তাআক্রান্ত হয় ।

লক্ষণ :

অনবরত হাঁচি, হঠাৎ করে একের পর এক হাঁচি। দুর্দমনীয় হাঁচির সাথে নাক দিয়ে তরল পানি ঝরা, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া। নাকের আগা, চোখ ও মুখ লাল হওয়া এবং মুখমন্ডলে ফুলাফুলা ভাব। নাকের ভেতর শির শির করা, মাথা ব্যথা ও ভারবোধ, চোখ চুলকায়। কোন কোন সময় হাল্কা কাশি হতে পারে , শরীরে জ্বর থাকে না বা মৃদু জ্বর থাকে ইত্যাদি —

ঋতু পরিবর্তন জনিত কারণে অ্যালার্জিক রানাইটিস যোক্ত হয়ে এর মাত্রা একটু বেশি বৃদ্ধি করে অনেক সময় (এ সময়ে রাইনো ভাইরাস যোক্ত হয়ে পরিস্থিতি কিছুটা খারাপ করে দিতে পারে) — ঘন ঘন হাঁচি হয়– নাকের জল গড়িয়ে পড়ে– নাকে জ্যাম জ্যাম অনুভূতি হয়।–ক্ষেত্র বিশেষে চোখ দিয়ে জল গড়ায়।– চোখের নিচের পাতা ফুলে যায়–চোখে লালচে উপসর্গ তৈরি হয়– চোখে কনজাং টিভার সংক্রমণ ও প্রদাহ হয়। তবে সচরাচর তা ২থেকে ৭দিনের মধ্যে সেরে যায়।

পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস (সব সময়ে নাকের সর্দি) :

সারাবছর ধরে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস হলে একে পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়। পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাটিসের উপসর্গগুলো সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের মতো।কিন্ত এক্ষেত্রে উপসর্গগুলোর তীব্রতা কম ও স্থায়িত্বকাল বেশি হয়।

এ রোগের সম্ভাব্য কারণগুলো হলোঃ- সারা বছর ধরে অ্যালার্জি জনিত নাসিকা প্রদাহের একটি সুনির্দিষ্ট কারণ হলো ঘরের অ্যালার্জি উদ্দীপক ধূলিময়লা (মাইট) , ছত্রাক-স্পোর, প্রাণির পরিত্যক্ত লোম বা ত্বকের কোষ। আবার একই রকম উপসর্গ ভৌত কিংবা রাসায়নিক উদ্রেককারী পদার্থ যেমন ঃ ধোঁয়া, দূর্গন্ধ, ঠান্ডা হাওয়া, অতি শুষ্ক পরিবেশ,অতিরিক্ত পুরাতন অপরিষ্কার কার্পেট , ফুড এলারজি জাতীয় খাবার, সিগারেটের ধোয়া ইত্যাদি বিষয় সমূহ লক্ষণীয়। এই ধরণের উপসর্গ জনিত অ্যালার্জিক রাইনাইটিসকে ভ্যাসোমোটর রাইনাইটিস বলা হয় ।

তবে এলার্জি জনিত কারণে হলে তা দীর্ঘস্থায়ী রোগ বা ক্রণিকে রূপ লাভ করতে পারে। । অনেক ক্ষেত্রে "হিউম্যান রাইনো" নামক ভাইরাস থেকে সংক্রামিত হয়ে থাকে বা খাবার-দাবার থেকে অ্যালার্জি হলে ও প্রায় সারাবছরই এ ধরণের উপসর্গগুলো দেখা দেয়। এ রোগের নামকরণে জ্বর শব্দটি থাকলেও মূলত এটি কোন জ্বর না। অসুখের প্রথম পর্যায়ে কোন জিনিস থেকে এ রোগের সূত্রপাত প্রথমে তা নির্ণয় এবং সেসব বস্তু (যেমন- ধুলাবালি, বিশেষ কোন খাবার) থেকে দূরে থাকলেই রোগ সেরে যায়।

পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস লক্ষণ ঃ-

পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের উপসর্গগুলো সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের মতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উপসর্গগুলোর তীব্রতা কম হয় এবং স্থায়িত্ব বেশি হয় ——(সেই সাথে অ্যাজমা বা হাঁপানি অথবা ফুস্ফুসের অন্যান্য অসুখ , কারও বেলায় একটু বেশি থাকতে ও পারে)

এর উপসর্গ হচ্ছে কাশি, ঘন ঘন শ্বাসের সঙ্গে বাঁশির মতো শব্দ হওয়া বা বুকে চাপ চাপ লাগা, বাচ্চাদের ৰেত্রে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা লাগা। রাতে ঘুম থেকে উঠে বসে থাকা — সাইনাসের প্রদাহ বেড়ে যাওয়া – রোগীর প্রচন্ড – ক্লান্তি অনুভব করা । নিদ্রাহীনতায় ভোগা – যে দিকে ঘুমানো হয় এর উল্টো দিকের নাসারন্ধ্র বন্ধ হয়ে থাকা -এ ধরণের আক্রান্ত রোগিরা কার ও সাথে কথা বলতে বারে বারে নাকে হাত নিয়ে কথা বলতে অভ্যাস হয়ে যায় বা কাউকে দূর থেকে দেখলে সব সময় ই নাকের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে নাক পরিষ্কার করার বদ অভ্যাস প্রায় ই নজরে পরে — ইত্যাদি । এ্যাজমা রোগীরা হে ফিভারে আক্রান্ত হলে রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়।

প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা কি

রোগীর পারিপার্শ্বিক বা বংশানুক্রমিক ইতিবৃত্ত অবশ্যই ভালভাবে জানা প্রয়োজন সেই সাথে

সিরাম আইজিইয়ের মাত্রা : সাধারণত এলার্জি রোগীদের ক্ষেত্রে আইজিইয়ের মাত্রা বেশি থাকে।

স্কিন প্রিক টেস্ট : এই পরীক্ষায় রোগীর চামড়ার ওপর বিভিন্ন এলারজেন দিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং এই পরীক্ষাতে কোন কোন জিনিসে রোগীর এলার্জি আছে তা ধরা পড়ে এবং সঠিক এলারজেন ধরা পড়ে ।

অর্থাৎ কোন ধরণের রেনুতে রোগীর এলার্জি রয়েছে তা অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সন্দেহভাজন রেনুর নির্যাস দেখে স্কীন টেস্ট করলে তা জানা যায়। আর এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেহেতু প্রকৃত এলার্জি সৃষ্টিকারি রেনু সনাক্ত করা যায় তাই নির্দিষ্ট সেই রেনুর নির্যাস ব্যবহার করে হাইপোসেনসিটাইজেশন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে ভাল ফলাফলও পাওয়া যায়।

রক্ত পরীক্ষা বিশেষতঃ ইয়োসিনোফিলের মাত্রা বেশি আছে কিনা তা দেখা। সিরাম আইজিই এর মাত্রা ঃ সাধারণত এলার্জি রোগীদের ক্ষ্মেত্রে আইজিই এর মাত্রা বেশি থাকে।। সাইনাসের এক্স-রে অনেক সময় প্রয়োজন হতে পারে –

চিকিৎসাঃ-
সমন্বিতভাবে এ রোগের চিকিৎসা হলোঃ এলারজেন পরিহার- যখন এলার্জির সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তখন তা পরিহার করে চললেই সহজ উপায়ে এলার্জি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং ঠান্ডা বাতাসে চলাফেরা না করা সেই সাথে নাকের পানি ও এলারজি প্রতিরোধ করার জন্য ওষুধ প্রয়োগ করতে পারেন এবং ইহা সাময়িকভাবে এলার্জির উপশম অনেকটা পাওয়া যায়। এ রোগের প্রধান ওষুধ হলো এন্টিহিস্টামিন ও নেজাল স্টেরয়েড। এন্টিহিস্টামিন, নেসাল স্টেরয়েড ইত্তাদির ব্যবহারে রোগের লক্ষণ তাৎক্ষণিকভাবে উপশম হয়। যেহেতু স্টেরয়েডের বহুল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তাই এ ওষুধ একনাগাড়ে বেশিদিন ব্যবহার করা যায় না। যতদিন ব্যবহার করা যায় ততদিনই ভাল থাকে এবং ওষুধ বন্ধ করলেই আবার রোগের লক্ষ্মণগুলো দেখা দেয়।
(চিকিৎসকের পরামর্ষ নিয়েই নিচের ব্যাবস্থা গ্রহন করা উচিৎ) যেমন ঃ-
– অ্যান্টি হিস্টামিন জাতীয় ঔষধ সেবন ঃ লোরাটাডিন ১০ মিঃ গ্রাঃ দৈনিক ১টা করে একমাস।
সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট ন্যাসাল স্প্রে- দুই নাকের ছিদ্রে দিনে ৪ হতে ৬ বার।
বেকলোমিথাসোন ডাই প্রোপিওনেট বা বুডিসোনাইড জলীয় ন্যাসাল স্প্রে প্রতি নাকের ছিদ্রে দিনে ২বার ব্যবহার ।
যে সকল রোগী উপরের চিকিৎসায় বিফল তাদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ-কার্যকরী কর্টিকোস্টেরয়েড মাংশে ইনজেকশেন রূপে ব্যবহার করলে উপসর্গ উপশম হয় তবে তা বেশি দিন ব্যাবহার করলে জীবন ধংশকারির মত মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন ।)
পুরানো অবস্থায় নাকের অসুবিধা থাকলে বা নাক বেশি বন্ধ হলে Spray Antazol; মাত্রা – শিশুদের জন্য ০.০৫% এবং বয়স্কদের জন্য ০.১% নাকের ভিতর দিন ২-৩ বার দিতে পারেন –
শরীরে দূর্বলতা থাকলে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স (B-Complex) জাতীয় ঔষধ
রক্তশুন্যতা থাকলে রক্তবর্ধক ঔষধ Syp. Ferglucon জাতীয় ঔষধ প্রয়োজন হতে পারে
এই ওষুধগুলো নিয়মিত এবং যথানিয়মে ব্যবহার করতে হবে। সেই সঙ্গে নিম্নের ঔষধ সমূহ দেওয়ার জন্য ও উপদেশ দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞরা । যেমন-চোখে মেডিকেটেড ড্রপ ব্যবহারে আরাম পাওয়া যায়। এতে থাকে উপশমী লুব্রিকান্ট, এন্টিহিস্টামিন এবং স্টেরয়েড। নিয়মিত ব্যবহারে প্রদাহ অনেক কমে যায়।
স্যুড্রোফেড্রিন টেবলেট নাকের রাস্তা পরিষ্কার করে দেয় এবং শুষ্ক রাখে। তবে এই ওষুধের কিছু পার্শ¦ প্রতিক্রিয়া আছে। যেমন শরীরে মৃদু কম্পন, মুখের অসুবিধা, দুশ্চিন্তা এবং রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া সেই কারণে যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, তারা এই ওষুধটি খাবেন না
।কার্টিসোল স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন না নেয়াই উত্তম। ইঞ্জেকশনের ফলে মাত্র এক বা দুই সপ্তাহের উপশম হয়। ফলে বার বার ইঞ্জেকশন দিতে হয়। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক মারাত্মক। সেই কারণে ক্যাটিনোল স্প্রে নেয়া ভালো।
তবে ভ্যাসোমোটর অ্যালার্জিক রাইনাইটিস চিকিৎসা দ্বারা নির্মূল করা খুভ কঠিন। তবে এক্ষেত্রে ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড নাকের ছিদ্রে দিনে ৩ হতে ৪ বার ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। মুলত এর জন্য পরবিশে ও জল্বায়ুর পরিবর্তন করলে অনেকে তা সেরে যায়

হার্বাল চিকিৎসা ঃ–

প্রথম অবস্থায় – আদার রস, বাসক পাতার রস, তুলসী পাতার রস মধু দিয়ে খেলে উপকার হয়।– গরম আদার চা খুবই উপকারী।– ভিটামিন-সি যুক্ত ফল খাওয়া– . কালোজিরা পুটলিতে বেধে নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিলে সর্দি ও হাঁচি বন্ধ হয়।
লবণ মিশ্রিত গরম পানি ব্যবহার ঃ- নাক বন্ধ হয়ে গেল আধা গ্লাস হাল্কা গরম পানিতে কয়েক চিমটি লবণ মিশিয়ে তা নাকে টেনে নেয়া। বা আদা ও তুলসি পাতার রস মধুর সাথে মিশিয়ে সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে রসুন বেশ উপকারী ।
সর্বশেষ প্রমাণিত কিছু ভেষজ এলারজিক রানাইটিসের জন্য
বাটারবার (Butterbur) ঃ- (Petasites hybridus, 500 mg per day) — ইহা সাধারনত হাঁপানি এবং ব্রঙ্কাইটিসের মিউকাস জাতীয় কাশি বাহির করতে খুভি ফলদায়ক বিদায় এলারজিক রানাইটিসে ভাল সহায়ক হিসাবে প্রমাণিত । (রিসাচ ল্যাব)
বিছুটি জাতের গাছ Stinging nettle ঃ- (Urtica dioica, 600 mg per day for one week) — এলারজিক রানাইটিসের জন্য ফলদায়ক তবে গর্ভ বতি মা এবং শিশুদের জন্য নিষেধ ।
গুলঞ্চ Tinospora cordifolia ঃ- (300 mg three times daily) — কিছুটা উপকারী তবে দুধদাতা মা এবং শিশুদের জন্য ক্ষতিকর (রিচারচ চলিতেছে)

ভ্যাসোমোটর অ্যালার্জিক রাইনাইটিস (Vasomotor rhinitis) ঃ-
ইহা ও এক ধরণের হে ফিভার বা নাকের সর্দি কিন্তু এর জন্য কোন ভাইরাস দায়ি নয় – (non-allergic rhinitis)
কারন সমূহ কি ? ঃ- শুষ্ক বায়ুমন্ডলের আবহাওয়া , বায়ু দূষণ, অ্যালকোহল, সিগারেট, কিছু ঔষধ, মসলাযুক্ত খাবার বা শক্তিশালী কিছু রাসায়নিক পদার্থের পাশে জীবন যাপন ইত্যাদি
লক্ষণ চিকিৎসা সব ই পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এর মত এবং শুধু মাত্র এর জন্য সবচেয়ে ভাল ব্যাবস্তা বলতে একমাত্র জলবায়ু পরিবর্তন করা ছাড়া সম্পূর্ণ ভাল হওয়ার আসা করা অসম্বভ (যেমন গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মানুষ যখন শীত প্রধান দেশে এসে বস বাস করেন তাদের মধ্যেই এই অসুখ টি বেশি দেখা যায়) এর জন্য ৮০% বেলায় জলবায়ু বা পরিবেষ পরিবর্তন না করলে সম্পূর্ণ ভাল হওয়া খুভি কস্টকর ।

ধুলোর জীবাণুগুলো কী কী
অতি ক্ষদ্র আনুবীক্ষণিক এ প্রাণীগুলো আটপায়ের অ্যারাকনাইড় পরিবারের অন্তর্গত। অাঁটুলি পোকা এবং চিগার একই পরিবারভুক্ত। এগুলো শক্ত দেহের অধিকারী। এরা ৭০ ডিগ্রী ফারেনহাইট বা তার উচ্চ তাপমাত্রায় ভালোভাবে বাঁচতে পারে। ৭৫-৮০ শতাংশ আর্দ্রতাই এদের পছন্দ। আর্দ্রতা ৪০-৫০ শতাংশের কম হলে এদের বংশ বৃদ্ধি হয় না। শুষ্ক আবহাওয়ায় এদের দেখা যায় না।
দেখা গেছে, শতকরা ১০ ভাগ মানুষ এদের কারণে আক্রান্ত হয়। অ্যাজমা রোগীদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই এদের সংস্পর্শে এলে অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।
এ জীবাণুদের নুখ মুখ বা মলের সংস্পর্শে মানুষের শরীর আসলেই অ্যালার্জি হয়। এদের সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বালিশে, মাদুরে, কার্পেটের ভাঁজে এবং আসবাবপত্রের তলায়। ঝাড়ু দিলে বা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার প্রয়োগ করলে এরা বাতাসে ভাসতে থাকে অথবা হেঁটে হেঁটে অন্যপ্রান্তে সরে যায়। অ্যালার্জি রোগীদের শ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে এবং উপসর্গ বাড়িয়ে দেয়। এক মুঠো ধুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৯০০০ পর্যন্ত জীবাণু থাকতে পারে। গড়ে এ সংখ্যা প্রতি গ্রামে ১০০০০। প্রত্যেক জীবাণু দিনে ১০টি নতুন মাইটস সৃষ্টি করে। এদের বেঁচে থাকার মেয়াদ ৩০ দিন। – (আর ও জানতে ধুলা মাইটসে দেখুন –)

অ্যালার্জি প্রতিরোধ ঃ-
অ্যালার্জি প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো, মুল কারণগুলো শনাক্ত করে তা এড়িয়ে চলা। বিশেষ করে রোগীকে খুব সতর্কতার সঙ্গে খুঁজে বের করতে হবে তার শরীরে কী কী কারণে অ্যালার্জি হয়।
অ্যালার্জি চিকিৎসার বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করার পর —রোগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এবং অ্যালার্জির প্রকৃত কারণ শনাক্ত করার পর ভ্যাকসিনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। (১০০% নিশ্চিত)
এলার্জি ভ্যাকসিন বা ইমুথেরাপি ঃ এর মূল উদ্দেশ্য হলো যে মাইট দ্বারা এলার্জিক রাইনাইটিস সমস্যা হচ্ছে সেই মাইট এলারজেন স্বল্প মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। ক্রমান্বয়ে সহনীয় বেশি মাত্রায় দেয়া হয় যাতে শরীরের এলার্জির কোন প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয় কিন্তু শরীরের ইমিউন সিস্টিমের পরিবর্তন ঘটায় বা শরীরের এলার্জির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলে অর্থাৎ আইজিইকে আইজিজিতে পরিণত করে) তাই এ ধরনের এলার্জিক রাইনাইটিসের ক্ষেত্রে ইমুনোথেরাপি বা ভ্যাকসিন বেশি কার্যকর।
গরম ও উষ্ণ তরল খাবার খাওয়া – নাকের ভিতর পরিষ্কার রাখ উচিত-পরাগরেণুর সংস্পর্শে না আসা– শীত বা বর্ষা মৌসুমে যখন বাতাসে পরাগরেণু ভেসে বেড়ায় তখন দরজা জানালা বন্ধ রাখা-
যে উদ্দীপক অ্যালার্জি তৈরি করে ত্বকের সংবেদন পরীক্ষার মাধ্যমে সেই অ্যালার্জেন হতে দূরে থাকা যেমন ঃ- অনেক ধরণের খাবার আছে যা শুধু মাত্র আক্রান্ত ব্যাক্তি কে এড়িয়ে চলতে হবে অর্থাৎ যার জন্য এ অ্যালার্জি হয় তা থেকে দূরে থাকা উচিত (সকলের এক ধরণের খাবারে এলারজি বাড়ে ইহা ও সত্য নয়, তারপর ও চিংরি, বাদাম এই সব খাবার একটু বেশি এলারজেটিক, তবে সকলের বেলায় নয়)
সিজনাল সময়ে ঃ- (ফ্যানের বাতাস বন্ধ রাখুন এবং বাহিত থেকে রুমে আনা সাময়িক বন্ধ করুন – বাহিরের রুদ্রে কাপড় চোপড় না শুকানো ভাল – গোসলের সময় জামা কাপড়ের পরিবর্তন নিত্য করা উচিৎ – যদি পারেন ইয়ার ফিল্টার রুমে ব্যাবহার সবছেয়ে ভাল –)
যাদের সব সময় লেগে থাকে ঃ- সব সময় আপনার বালিশ বা তোশকের কবার পরিষ্কার না রাখলে মাইট থেকে হয়ে থাকে । পুরাতন কার্পেট ,ফ্লোর অথবা অথবা ব্যাবহারিক জিনিস পত্র এবং দরজা জানালার পর্দা ইত্যাদি থেকে , ঘরের পোষা পালিত যে কোন প্রানির লোম থেকে হয় বিধায় এই সব বিষয় এড়িয়ে চলা
পুষ্পরেণু থেকে মুক্ত থাকার কিছু টিপস্ : (সংগৃহীত)
দুপুর পর্যন্ত ঘরে থাকুন দুপুরের পরে বাতাসে পুষ্পরেণুর পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হয়। ঝড়ো দিনে বা প্রবল বাতাস থাকলে বাইরে যাবেন না।

* চোখ বাঁচানোর জন্য সানগ্লাস ব্যবহার করুন
* বাগানের ঘাস কাটার কাজে নিয়োজিত হওয়া চলবে না যদি কাটতেই হয়, তাহলে মাস্ক পরে কাজ করবেন।
* বাড়ির বাগানে এমন ধরনের গাছ বেছে বেছে লাগান যেগুলো এলার্জি তৈরি করে না।
* বাড়ির জানালা বন্ধ রাখুন। বিশেষ করে রাস্তায় চলার সময় গাড়ির কাঁচ তুলে দেবেন।
* পরাগায়নের মৌসুমে বনভোজনে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকুন।
* ছুটির দিনগুলো দূষণমুক্ত এলাকায়, বিশেষ করে নদী বা সমুদ্রতীরে কাটাতে পারেন।
* বাড়ির বাগানের কোন গাছ বা আগাছার কারণে এলার্জি হচ্ছে, তা নিশ্চিতরূপ জানতে পারলে গাছটি অপসারণ করুন।
* কাজ শেষে বাড়িতে ফিরেই গোসল করুন। সুযোগ পেলেই চোখে পানি দিয়ে পরিষ্কার করুন।
* সঙ্গে সব সময় রুমাল বা টিস্যু পেপার রাখুন।
ধন্যবাদ —————— (চলবে)

যারা নাকের সর্দিতে ভোগেন প্রায় সময় , তারা সত্য কিছু কথা জেনে নেওয়া ভাল !!!!
ইউকে ,ইউরোপ অ্যামেরিকা বা শীত প্রধান দেশে ৮০% এর বেলায় নাকের সর্দি, শিশুদের ঘন ঘন নিউমোনিয়া,হাঁপানি বা শ্বাস কস্ট ইত্যাদি দেখা দেওয়ার মুল কারন ঘরের কার্পেটের জমে থাকা ডাস্ট এবং বিশুদ্ধ বাতাস ঘরে ঢুকতে না দেওয়া ঠিক তদ্রুপ প্রাপ্ত বয়স্কদের বেলায় যারা সব সময় গড়ি ব্যাবহার করেন তাদের বেলায় না কমার কারন গাড়ির ভিতরের ডাস্ট এবং বাহিরের কিছু ফ্রেস বাতাস গাড়িতে ঢুকতে না দেওয়া – তাই সামান্য বিষয় একটু খেয়াল রাখলে অনেক ধরণের মারাত্মক অসুখের ঝুঁকি থেকে রেহাই পেতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস —
অ্যালার্জি হলে ভালো হয় না ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয় । বিশেষ করে রোগীকে খুব সতর্কতার সঙ্গে খুঁজে বের করতে হবে তার শরীরে কোনঅ্যালার্জেনের কারণে অ্যালার্জি হয়েছে এবং সে জন্য হাইপোসেনসিটাইজেশন পদ্ধতিতে অনুসরণ করে বুজে নিবেন আপনার কিসে অসুবিধা এবং তা থেকে বিরত থাকলে ১০০% আশা করতে পারেন সম্পূর্ণ সুস্থ থাকার এবং সেই সাথে এলার্জি ভ্যাকসিন দিয়ে রাখুন যাতে আবার পুন আক্রান্ত না হন – তবে পরিবেষ গত কারণে হলে জল্বায়ুর পরিবর্তন না করলে অনেক সময় তা কমানো খুভ অস্টকর হয়ে যায় ।
এ ছাড়াও আমারা সবাই জানি এ জাতীয় রোগের প্রধান ওষুধ হলো এন্টিহিস্টামিন ও নেজাল স্টেরয়েড।
এন্টিহিস্টামিন, নেসাল স্টেরয়েড ব্যবহার রোগের লক্ষণ তাৎক্ষণিকভাবে ভাল হয় শুধু মাত্র সিসনাল সর্দিতে কিন্তু যারা সারা বছর ধরে ভোগেন তাদের বেলায় এ জাতীয় ঔষধ সাময়িক কিছুটা ধ্মানো ছাড়া আর অন্য কিছু নয় । অর্থাৎ স্টেরয়েডের বহুল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তাই এ ওষুধ একনাগাড়ে বেশিদিন ব্যবহার করা যায় না। যতদিন ব্যবহার করা যায় ততদিনই ভাল থাকে এবং ওষুধ বন্ধ করলেই আবার রোগের লক্ষ্মণগুলো দেখা দেয়। অন্য দিকে নাকের ড্রপ বেশি দিন ব্যাবহার করলে নাকের পিছনের হাড়ের প্রদাহ বেড়ে যায় বা বাকা হয়ে যায় – সে জন্য বেশি দিন এই সব ঔষধ নিজের ইছছায় সেবন থেকে বিরত থাকবেন ।
ধন্যবাদ

CATEGORIES স্বাস্থ্য ও জিবন

জ্বর কি ? হাঁচি, কাশি সর্দি কি ? মৌসুমি এবং ইনফ্লোয়েঞ্জা জ্বর কি ? এবং জ্বর নিয়ে কিছু ভুল ধারনা ইত্যাদি –

PUBLISHED ON *September 9, 2014 by Health (স্বাস্থ্য) -1 Comment*

i
4 Votes

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/09/in-3.jpg)

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/09/in-1.jpg)

(Reference last update verssion 2011 and lateset update 08/08/2014 – Virology research jhons hopkins & Medical school uno of bristol)

জ্বর বা পাইরোজেন কি ? বা কিভাবে ইহা বাড়ে ? (বিজ্ঞান অনুসারে)
জ্বর হল দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেরে যাওয়া অর্থাৎ দেহে পাইরোযেন বেশি বেড়ে যাওয়া । এখন প্রশ্ন আসবে পাইরোজেন কি ?- পাইরোজেন হল একটা তাপজীবাণুঘটিত এক ধরণের বিষ এবং ঠিক যখনি এই বিষ শরীরের যে সকল অংশ ঠিক মত তাপ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বিকল করে দেয় । (যার বাহক হল ভাইরাস , ব্যাক্টোরিয়া ইত্যাদি) ঠিক তখনি আমাদের শরীরে জ্বর দেখা দেয় (মেডিক্যাল সাইন্স অনুসারে সে জন্য তাপ কে পাইরেকশিয়া বলা হয়)
মুলত পাইরোজেন আমাদের শরীর কে বাহিরের জিবানুর আক্রমণ থেকে প্রতিরোধ করে রাখতে চায় এবং সে জন্য রক্তের মাধ্যমে শরীরের হরমোন, এনজাইম ও রক্তকণিকাদের (শ্বেত কণিকা) খুব দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে জিবানু সমূহ কে মারতে থাকে ঠিক তখনি আমরা তাপ অনুভব করি এবং তখন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অঞ্চলের ভেসোমোটরে সংকেত পাঠিয়ে দেহের সব রোমকূপ বন্ধ করে দেওয়ার চেস্টা করে বা মনে করতে পারেন কোন জীবানূ ঢুকতে না পারে এবং আমাদের রক্তনালীগুলোকেও সংকুচিত করে দেয়, যেন পাইরোজেন সহজেই জীবাণুদের ধরে ধরে মারতে পারে। তখন রক্তনালী সংকুচিত হলে রক্ত প্রবাহের গতি যায় বেড়ে, বা অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হয়।
মনে রাখবেন একজন সুস্থ মানুষের শরীরের তাপমাত্রা ৯৭ ডিগ্রী ফারেনহাইট হতে ৯৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত থাকে এবং এর উপরে গেলেই আমরা তাকে পাইরেকশিয়া বা জ্বর বলে থাকি

প্রাথমিক ভাবে জ্বর হওয়ার কারন কি হতে পারে ?
যে কোন প্রকারের ভাইরাসে আক্রান্ত হলে — ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে–শরীরে কোন প্রকার ইনফেকশান দেখা দিলে (বুকের ইনেফেকশনের কারণে বেশি হয়ে থাকে) – কোন প্রকার পরজীবীর সংক্রামণ দ্বারা আক্রান্ত হলে — শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেম প্রতিরক্ষা ক্ষমতা কমে গেলে জ্বর হতে দেখা যায়

কি ধরণের ভাইরাস দ্বারা সাধারণ জ্বর হয়ে থাকে ?
সাধারণত ২০০ ধরনের ভাইরাস দিয়ে এ সর্দি কাশি হতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাইনো ভাইরাস (৩০-৮০ শতাংশ), করোনা ভাইরাস (১০-১৫ শতাংশ) এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (২০-২৫ শতাংশ) , রেসপিরেটরি সিনসাইটিয়াল ভাইরাস, এডেনো ভাইরাস, এন্টারো ভাইরাস, মেটা নিউমোনিয়া ভাইরাস ও কোরোনা ভাইরাস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আক্রমণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঋতু পরিবর্তনজনিত কারনেই হয়ে থাকে – প্রথমে সাধারণ সর্দি কাশি জ্বর হলে ও খুভি দ্রুত তা ইনফ্লোয়েঞ্জা ভাইরাস আক্রমণ করে ফ্লো জ্বরে পরিণত করে – (এর ও কয়েকটি ভাগ রয়েছে যেমন বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু ইত্যাদি)
রাইনো ভাইরাস জনিত জ্বর (ভাইরাস টি আক্রমণের সাথে সাথেই শরীরে কাপুনি দিয়ে শীত আসে এবং মুলত ঠাণ্ডা জ্বর শীত মৌসুমেই বেশি হয়ে থাকে যার মুল কারন রাইনো ভাইরাস (৬০%) , তবে গরম মৌসুমে ও ঠাণ্ডা জ্বর হয় তবে তা খুভ কম (২০%) মত ।
• অ্যাডোনো ভাইরাস ঃ অ্যাডোনো ভাইরাস আক্রমণ করে ধীরে ধীরে এবং জ্বরের সাথে অ্যাডোনো টাইপ -১০,

-শ্বাসনালি ও নরম মাংসপেশিকে আক্রমণ করে অন্য দিকে অ্যাডোনো ভাইরাস টাইপ -৪০/৪১, পাকস্থলিতে আক্রমণ করে বিধায় গেস্ট্রইন্টেস্টেনাইল জাতীয় অসুখ বা ডায়রিয়া জাতীয় অসুখ বাড়িয়ে দেয় এবং সাথে জ্বরের সকল বিদ্যমান থাকে ।

কী কারণে গরমের সময় সর্দি জ্বর হয় ?

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে মানুষের শক্তির অপচয় হয় অনেক। এই গরমে শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই প্রতিনিয়তই কোনো না কোনো স্বাস্থ্য-সমস্যায় আক্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক । সর্দি-জ্বর মানব দেহের ঊর্ধ্ব-শ্বাসনালীর ভাইরাসজনিত এক ধরনের সংক্রমণ। গরমের সময় ইনফ্লুয়েনজা-এ, ইনফ্লয়েনজা সি , এডেনোভাইরাস , রাইনো – প্রভৃতি দায়ী। অনেক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটতে পারে। ঋতু পরিবর্তনের সময় এ রোগ বেশি মাত্রায় দেখা যায়। একটানা বৃষ্টি, স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ, অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা সেই সাথে গাছ পালার ঝরা ফুলের রেনু, ধলা বালি, ও দূষিত অন্যান্য বায়বীয় পদার্থ ইত্যাদি হালকা ঘুড়ি বৃষ্টির বাতাসের সাথে মানুষের শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করে ও এলারজি জাতীয় সর্দি কাঁসির উৎপত্তি করে একটু বেশি । এই সময় পরিবার বা আশে পাশের একজন আক্রান্ত হলে ধিরে ধীরে অন্যান্য সবাই আক্রান্ত হবেন উক্ত ব্যাক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে- যার কারণে মন রাখবেন ইহা ও একটি ছোঁয়াচে ভাইরাস জাতীয় অসুখ ।

– তবে যাদের শরীরের প্রতিরোধ শক্তি কম তারা খুভ তাড়া তাড়ি আক্রান্ত হবেন (এদের বেলায় বৃদ্ধ বা শিশুর চাইতে ও বেশি আক্রান্ত হতে দেখা যায় , সেই হিসাবে যদি একজন মানুষ কে দেখতে সভাবিক মনে হওয়ার পর ও যদি সে বছরে ৪ বারের উপর বেশি সময় সর্দি জাতীয় জ্বরে আক্রান্ত হয় , তা হলে একেবারে নিশ্চিত ভাবে বলতে পারেন তিনির অন্য কোন ধরণের মারাত্মক প্রদাহ জাতীয় সমস্যা আছেই অথবা দেহের প্রতিরোধ শক্তি একেবারে কম , (এলারজি জাতীয় অসুখ এর আওতায় পড়বেনা)

ঋতু পরিবর্তনে সাধারণ সর্দি-কাশি জাতীয় জ্বরের লক্ষণ ঃ

এ সময় অনেকের বেলায় সামান্য সর্দি কাশি হওয়ার পর অল্প জ্বর এসে আবার ভাল হয়ে যান ৬৫% + ২০% বেলায় পুন আক্রমণ করে । অন্যদিকে পুনাক্রমন যাদের কে করে তাদের বেলায় ৭০% রোগি ইনফ্লোয়েঞ্জা জাতীয় ভাইরসে আক্রান্ত হয়ে থাকেন । সর্দি-কাশি একটি ভাইরাসজনিত প্রদাহ সৃষ্টিকারী রোগ, যা আমাদের শ্বসনতন্ত্রে বিশেষত গলায়, নাকে এবং সাইনাসে প্রদাহ সৃষ্টি করে।

ভাইরাস ইনফেকশন হওয়ার পর ১৬ ঘণ্টা থেকে শুরু করে ২-৪ দিনের মধ্যে সাধারণত যে যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। (৫/৭ দিন থাকতে পারে বা অনেক সময় ৪৮ ঘন্টার ভিতর ভাল হয়ে যান ৫০%)

হঠাৎ করে নাকে ও গলায় সুড়সুড়ি লাগে, জ্বালা করে। – হাঁচি আসা -, নাক দিয়ে অনবরত পানি ঝরা , নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া – গা ম্যাজ ম্যাজ ও ব্যথা করে, গলা ব্যথা করা ও ঢোঁক গিলতে কষ্ট হওয়া , মাথা ঘোরা, মাথা ব্যাথা হওয়া বা মাথা ভার ভার লাগে, অবসাদগ্রস্ততা মনে হওয়া এবং তখন সামান্য জ্বর আসবেই অথবা জ্বর জ্বর অনুভূতি আসতে পারে (৬০% বেলায় ১২/২৪ ঘন্টার ভিতর সেরে ও যায়) । ৪০% বেলায় পূর্ণ জ্বর চলে আসে – (তখন ব্যাকটেরিয়া জাতীয় জিবানু আক্রমণ করলে সাইনাসের ব্যথা, কানব্যথা, ফুসফুসের প্রদাহ হতে পারে) । অনেকের এভাবে ঘন ঘন জ্বর ওঠানামা করতে করতে ৪০% বেলায় অসুখ টি ইনফ্লোয়েঞ্জা জাতীয় জ্বরে চলে যেতে পারে বলে মনে করতে পারেন ।

ইনফ্লোয়েঞ্জা জাতীয় জ্বর ঃ–

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ধরন তিনটি – সেগুলো হল টাইপ এ, বি ও সি (A, B, C)। টাইপ এ পাওয়া যায় পাখি, শূকর, ঘোড়া এবং সীলের মধ্যে যা খুভি ভয়ঙ্কর (সোয়াইন ইনফ্লুয়েঞ্জা, বার্ড ফ্লো ইত্যাদি) তবে ইনফ্লুয়েঞ্জা বি ভাইরাস মাঝে মাঝে কিছু মহামারীর জন্য দায়ী হলেও ইনফ্লুয়েঞ্জা সি ভাইরাস তেমন ক্ষতিকর নয়। এ এবং বি ইনফ্লোয়েঞ্জা ভাইরাস বেশির ভাগ শীতের সময় মহামারীর আকার ধারন করতে দেখা যায় এবং সি মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস জনিত অসুখে যোগ হয়ে কিছুটা ক্ষতি করে থাকে ।

ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষন ঃ
ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমে উপসর্গ হিসাবে – ঠাণ্ডায় কাঁপুনি এবং ১০৩ ডিগ্রির উপর জ্বর – দুর্বলতা এবং ক্লান্তি বা অবসাদ – মাথা ব্যথা এবং চোখে ব্যথা – গলা ফুলে ওঠা – শুষ্ক কাশি – পেশিতে ব্যথা অস্থির লাগা সহ এগুলো শুরু হয় এবং এভাবে প্রায় ৩ দিন ধরে জ্বর থাকে, শ্বসননালীর সমস্যাগুলো প্রায় সপ্তাহ ব্যাপি থাকে। ব্যক্তি ভেদে ১ থেকে ৩ সপ্তাহ ধরে দুর্বল লাগতে পারে। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি জ্বর ও বমি থাকতে পারে। কিছু কিছু শিশুর কানে ব্যাথ্যা ও পরে প্রদাহ হতে পারে ।
দ্বিতীয় পর্যায়ে (৫/৭ দিনের ভিতর) ঃ- ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে নিউমোনিয়া (Pneumonia) হওয়ার সম্বাভনা ৭০% । বিশেষ করে যারা শ্বাস প্রশ্বাস জনিত অন্য রোগে ভুগতেছেন সে সময় অনেক ক্ষেত্রেই ভাইরাল নিউমোনিয়ার (Viral Pneumonia) সাথে ব্যাক্টেরিয়াল নিউমোনিয়া (Bacterial Pneumonia) যোগ হয়ে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । হাঁপানি ও শ্বাস কস্টের অন্যান্য যে কোন আসুখ থাকলে তা ও বেড়ে যাবে । (হার্টের অসুখ জনিত রোগী ও শিশুদের একটু বেশি সতর্ক থাকা উচিৎ, কেননা ৩% বেলায় ব্রেইনে স্ট্রোক হওয়ার সম্বাভনা আছেই)
একটা বিষয় সামান্য মনে রাখলে ভাল হবে – ঠাণ্ডা জ্বর (কোল্ড ফিভার, রাইনো ভাইরাস) এবং সর্দি জ্বর (ইনফ্লোয়েঞ্জা) দুটি দুই ধরণের ভাইরাসে আক্রান্ত করলে ও অনেক সময় দুটি একত্রীত হয়ে একই ধরণের লক্ষণ প্রকাশ পায় । তারপর ও ঠাণ্ডা জ্বর ধীরে ধীরে আক্রমণ করে (রাইনো ভাইরাসের নিয়ম অনুসারে) এবং ইনফ্লোয়েঞ্জা জ্বর হঠাত করেই চলে আসে এবং এলারজি জনিত সর্দি জ্বর নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়তেই থাকে ও হালকা জ্বর থাকতে পারে যা সকাল বিকালে কমবেশি বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায় আবহাওয়ার তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে ।

মৌসুমি জ্বরের ভাইরাস কতদিন মানবদেহে থাকতে পারে ? ঃ

- ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ঐ জাতীয় ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশের পর থেকে সাতদিন থাকে । সাতদিন পরে ফ্লুর ভাইরাস মানবদেহে আর থাকে না। কারণ এ সময় মানুষের দেহে ভাইরাসের বিপক্ষে এন্টিবডি তৈরি হয়ে যায় । এ ছাড়া এন্টি ভাইরাসের ফর্মুলা অনুসারে ইহা একবার আক্রান্ত হলে একই প্রজাতির ভাইরাস দ্বারা মানুষ আর দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হওয়ার কথা নয় ।

প্রশ্ন আসতে পারে , সর্দি জ্বরের আক্রমণের ৭ দিন পর ও জ্বর থাকে কেন ? তখন ৬০% বেলায় বেক্টোরিয়া জাতীয় আক্রমণে শরীরে জ্বর থাকে ইহা অনেকটা নিশ্চিত হতে পারেন সে জন্য আপনার চিকিৎসকের পরামর্ষে ভাল এক কোর্স এন্টিবায়োটিক সেবন করা আপনার জন্য অত্তান্ত ভাল (যদি ও সে সময় ৭০% বেলায় ফুসফুস , শ্বাস নালী, টন্সিলাইটিসের লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে)

ভাইরাল জ্বর ও ব্যাক্টোরিয়া জ্বরের সামান্য পার্থক্য ও আছে ঃ

(যদি ও দুটোর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম) – ভাইরাল জ্বরে গলা ফুলে লাল হয়ে টনসিলে ব্যাথা ও হতে পারে কিন্তু টনসিল যদি টনসিল সাদা বর্ণের মত দেখায় তা হলে ইহা ব্যাক্টোরিয়া জাতীয় জ্বর নিশ্চিত । অথবা ভাইরাল জাতীয় জিবানুর কারণে শরীরে কোন প্রদাহ হলে এক সাথে হবে কিন্তু ব্যাক্টোরিয়া জাতীয় প্রদাহ হলে সারা শরীরে এক সাথে দেখা দিবেনা (যেমন , শিশুদের বেলায় , চিকেন ফক্স ইত্যাদি) ভাইরাল জরের প্রদাহে কোন ব্যাথা থাকেনা তবে এলারজি জনিত চুলকানি থাকে । ভাইরাল জাতীয় জ্বরের বেলায় কফ পাতলা এবং দেখতে একটু সাদা ও পরিষ্কার বা হলুদ বর্ণের দেখাবে কিন্তু ব্যাক্টোরিয়া আক্রমনে সেই কফ সবুজ বা লাল্টে সবুজ দেখাবে । জ্বরের যে পার্থক্য দেখা যায় , ভাইরাল জাতীয় জ্বরে ১০২ ডিগ্রি জ্বর ২ দিনের উপর থাকেনা (পাইরোজেনের কারণে ৪৮ ঘন্টার ভিতর ভাইরাস ধংশ হয়ে যায়) কিন্তু এর চেয়ে বেশি সময় থাকলে ইহাকে ব্যাক্টোরিয়াল জ্বর সন্দেহ করা হয় । (১০০ ডিগ্রি জ্বর ভাইরাল হিসাবে ৫ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে) ।

মনে প্রশ্ন আসবেই কাঁসি বা কফ কি ? হাঁচি কি ?
সাধারণত একাধিক ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণে সর্দি-কাশি বা কফ তৈরি হয়। যা মানুষের দেহে দুটি ফুসফুসের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য বড়-ছোট শ্বাসনালী ও ফুস্ফসের ভিতর কয়েক লক্ষ ইয়ার ভিলাই বা বাতাস জমা হওয়ার থলি সেখানে ভাইরাস ব্যাক্টোরিয়া, ধুলা বালি আক্রমের ফলে মিউকাস এসে তা বাহির করে দেয় এবং ইহাই কফ।

যেমন আরেক টু পরিষ্কার ভাবে যদি বলি ঃ- শ্বাষ নালীতে নিশ্বাষের মধ্য দিয়ে বাইরের ধুলা বালি আবর্জনা, জীবানূ (ভাইয়াস, ব্যাক্টোরিয়া) ইত্যাদি ঢুকে পড়লে শ্বাষ নালী ও গুরুত্ব পূর্ণ শ্বাষ যন্ত্র ফুসফুস থেকে তা বাহির করার জন্য সেখান থেকে শ্লেষ্মা জাতীয় মিউকাসের মাধ্যমে তা বাহির করার চেস্টা করে , মুলত ইহাই সর্দি বা কাস (মিউকাস ঃ-

মিউকাস মেম্ব্রেইন হতে নিঃসরিত এক ধরণের পিচ্ছিল তরল বা আধা তরল পদার্থ। ইহা পাক প্রণালীতে খাদ্য দ্রব্যের সংগে মিশ্রিত হয়ে খাদ্র দ্রব্যকে পিচ্ছিল ও তরল ও সহজ পাচ্য করে) যদিও কাশি বা সর্দি প্রাথমিক ভাবে ইহা কোন অসুখ নয় কিন্তু যদি কোন কারণে কাফ বসে যায় বা আসতে চায়না তখন কফ বাহির করার ঔষধ অবশ্যই সেবন করা উচিৎ (সাল-বিউটামল বা ঐ জাতীয় ভেষজ (তুলশি, বাশক পাতা) যে কোন কফ বাহির কারক ঔষধ ।

হাঁচি কি? বা কেন আসে ? ঃ– আমাদের নাকের স্নায়ুকেন্দ্রগুলো অতি সুক্ষ । শরীরের পক্ষে কোন ক্ষতিকারক পদার্থ নাকের মধ্য দিয়ে শরীরে ঢোকার চেষ্টা করলেই স্নায়ু কেন্দ্রে তা বাধাপ্রাপ্ত হয় । এর ফলেই হাচি হতে থাকে । (হাঁচির স্টিমুলেশন বহন করে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ব্রেইনের ভেতর তা অপটিক বা চোখের নার্ভের কাছাকাছি থাকে) সে জন্য নাকের ভেতর ধুলাবালি ,ফুলের রেনু,ডাস্ট ইত্যাদি সহ ভাইরাস বা ব্যাক্টোরিয়া ইত্যাদি ঢুকলে কাশি সর্দির (মিউকাস) সাথে বাহির করার জন্য স্নায়ুগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে । তখন শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের স্নায়ুগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং হাঁচি আসে , এলারজি জনিত কারণে হলে অনবরত হাঁচি আসবেই (সেই সাথে নাক, কান, গলা চুলকাতে পারে বা চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে)

চিকিৎসা ঃ–

সর্দি-কাশির কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই, শুধু লক্ষণগুলোর চিকিৎসা করা ছাড়া। এজন্য প্রতিরোধই সর্দি-কাশি থেকে মুক্ত থাকার প্রধানতম উপায়।

প্রথমেই জ্বর কমানোর ব্যবস্থা হিসেবে যথাযথ মাত্রায় প্যারাসিটামল জাতীয় বা তাপমাত্রা নামিয়ে দেয় এমন ধরণের ওষুধ সেবন করতে পারেন এবং সর্দি কাশি যাতে নাক বা গলা বা ফুসফুসে জমে না থাকে সে জন্য উষ্ণতা ও পাতলা করার জন্য গরম ভাস্প পানির শ্বাস নিতে পারেন সাথে মেন্থাল মিশ্রিত করে দিলে আর ভাল অথবা নাকের ড্রপ ব্যাবহার করতে পারে (৩ দিনের উপর নাকের ড্রপ ব্যাবাহার উচিৎ নয়), সেই সাথে এলারজি জনিত মনে করলে এন্টি হিস্টামিন গ্রোফের ঔষধ বা সিরাপ ব্যাবহার করতে পারেন (সেট্রিজিন, লোরাটিডিন জাতীয় ওষুধ একক মাত্রায় খেয়ে দেখতে পারেন – অনেকের এন্টিহিস্টামিন শরীরে তন্দ্রা ভাব আনে বিধায় চিকিৎসকের পরামর্ষে তন্দ্রাবিহিন এন্টিহিস্টামিন সেবন করতে পারেন) কফ বাহির কারি সালবিউটামল জাতীয় গ্রোফের ঔষধ সেবন করতে পারেন (২ বছরের নিচের শিশুদের জন্য এবং হার্টের অসুখ জনিত ব্যাক্তিদের বেলায় চিকিৎসকের পরামর্ষ ছাড়া ব্যাবহার করবেন না) ।

সে সময় সাময়িক সাহায্য কারি হিসাবে মেন্থাল গরম চা অথবা গরম জলে লেবুর সঙ্গে মিশিয়ে আদা কুচি করে পান করলে সাময়িক একটু শরীরের চাঞ্চলতা বৃদ্ধি পেতে পারে । অথবা ভেষজ চিকিৎসা হিসাবে ১ চা চামচ জিরা এবং ৪-৬টা তুলসীপাতা এক গ্লাস পানিতে নিয়ে সিদ্ধ করে সেখান থেকে প্রতিদিন দুইবার ১ চা চামচ করে খেলে কিছুটা ফল পাওয়া যেতে পারে । পাশা পাশি খাবারের সাথে হালকা পাতলা জুল স্পাইসি খাবার খেলে অনেক টা ভাল ফল পাওয়া যায় ।

যদি ও কোনরকম জটিলতা ছাড়াই পাঁচ থেকে সাতদিনের মধ্যে অসুখ টি এমনিতেই সেরে যায় । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে (৪৩%) ইনফ্লোয়েঞ্জা ভাইরাসের আক্রমণে জটিল হয়ে যেতে পারে বিধায় গলা ব্যথা, কাশি, শ্বাসকষ্ট , মুখ ফুলা , নিউমোনিয়া বা আর অন্যান্য যে কোন উপসর্গ দেখা দিলে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্ষে এন্টোবায়োটিক সেবন করার চেস্টা করবেন । কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন জ্বর হওয়ার সাথে সাথেই যারা এন্টিবায়োটিক ব্যাবহার করেন তা সম্পূর্ণ ভুল বরং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নস্ট করে দেয় ।

সর্বশেষ তথ্য ঃ

- অবশ্য বর্তমানে এন্টিভাইরাল হিসাবে বহুল আলোচিত বেশ কিছু ঔষধ বাহির হয়েছে যা এফ ডি এ কৃতক অনুমুদিত Oseltamivir / Zanamavir (Relenza) Amantadine (Symmetrel) / গ্রুফের ঔষধ ব্যাবহার করা হয় ক্যাপসুল বা সিরাপ আকারে – যা ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধক হিসাবে ভাল সুনাম আছে বা যারা বারে বারে ইনফ্লোয়েঞ্জার শিকার হন তাদের জন্য বাজারে ভ্যাক্সিন ও বাহির হয়েছে তা প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করতে পারেন । বা সদ্য এফ ডি কৃতক অনুমোদিত ইনফ্লোয়েঞ্জা trivalent vaccine বা নাকের ড্রপ ব্যাবহার করলে পরবর্তী ১০ মাস পর থেকে আর ইনফ্লোয়েঞ্জা জাতীয় জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সম্বাভনা নাই । (বিস্থারিত নিচে ইংরেজি ভার্শনে দেওয়া আছে) এবং চিকিৎসার জন্য আপনার চিকিৎসকের সাথে যোগা যোগ করুন ।
  হারবাল হিসাবে আপনি নিম্নের ঔষধ ব্যাবহার করে দেখতে পারেন , যা সম্প্রতি গবেষণায় বিশেষ ভুমিকা রাখছে Andrographis (Andrographic paniculata) (গর্ভবতী ও দুধ দাতা মায়েদের জন্য নিশেধ) – অথবা

Echinacea (Echinacea purpurea, 300 mg 3 times per day) (টান্ডা জ্বরের জন্য ভাল একটা প্রতিষেধক)

ঘরোয়া সাময়িক সেবা সুস্রদ্ধার মধ্যে ঃ-
প্রথমেই চেস্টা করবেন একটু বিশ্রামে থাকার এবং যদি অতিরিক্ত জ্বর থাকলে সাধারণ তাপমাত্রার পানিতে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে সারা শরীর মুছে দেওয়া অর্থাৎ স্পঞ্জিং করা উচিত। জ্বর ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে নেমে না আসা পর্যন্ত এই স্পঞ্জিং চালিয়ে যআবেন । সে সময় আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখবেন অতিরিক্ত জ্বরে প্রচুর ঘাম হওয়ার ফলে শরীরে অচেতনতা প্রতিরোধ করে রাখতে প্রচুর পানি পান করার সাথে খাওয়ার সেলাইন বা লবন যোক্ত পানি অথবা ফ্রেশ ফলের রস খাওয়া দরকার । (লেবুর রস, আনারস, পেয়ারা বা আমলকি জাতীয় খাবার খাওয়া বেশ ভাল) তবে ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার (আইসক্রিম, ফ্রিজের পানি, কোল্ড ড্রিঙ্কস) পরিহার করতে হবে। এবং চেস্টা করবেন আপনার ব্যাবহারিক রুমাল টাওাল বা হাঁচির স্পর্শে অন্য কেউ যাতে সরাসরি না আসেন কারন ইহা ছোঁয়াচে (শিশুদের বেলায় অবশ্যই দূরে থাকার চেস্টা করবেন) অসুখ ভাল হওয়ার পর ও কয়েক সপ্তাহ পুষ্টিকর খাবার খেয়ে যাওয়ার চেস্টা করলে পরবর্তী ভাইরাস জ্বরের আক্রমণ অনেক দেরিতে আক্রান্ত হবেন ইহা নিশ্চিত ।
ধন্যবাদ

জ্বর নিয়ে কিছু ভুল শিখা বা ধারনা (সংগৃহীত)
এ সম্পর্কে অনেকের মধ্যে কিছু কিছু ভুল ধারণা রয়েছে। কেউ কেউ জ্বর হলেই রোগীর গায়ে কাঁথা, কম্বল, লেপ ইত্যাদি চাপিয়ে দেন। অনেকেই মনে করেন এতে করে রোগী ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাবে। ঠান্ডা হাওয়া আসার কারণে ঘরের দরজা-জানালও বন্ধ করে রাখেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর কোনোটাই জ্বর কমানোর পদ্ধতি নয় অথবা জ্বর কমাতে সাহায্য করেনা। জ্বর হলে এমনিতেই শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তখন যদি আবার শরীরে মোটাকাপড়, কম্বল জড়ানো হয় তবে শরীরের তাপমাত্রা আরও বেড়ে যাবে। তাই গায়ে প্রচুর কাপড় পরে বা লেপ-কম্বল ব্যবহার না করে বরং পাতলা ও ঢিলাঢালা কাপড় পরাই উচিত। শরীরের কাপড়-চোপড় যতটুকু খোলা সম্ভব খুলে দিতে হবে। ঘরের জানালা বন্ধ না করে দিয়ে বরং আলো বাতাস যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সেই সঙ্গে ফ্যান থাকলে সেটিও মধ্যগতিতে চালিয়ে দিতে হবে। এমনকি কম মাত্রায় এয়ার কন্ডিশনার চালানো যেতে পারে।

জ্বর হলে গায়ে তেল মালিশ করাও ঠিক নয়। এতে করে শরীরের লোমকুপগুলোতে ময়লা জমে বন্ধ হয়ে যায় এবং শরীরের বাড়তি তাপ বের হতে পারেনা। জ্বর হলে আমাদের উচিত জ্বরের ধরণাটা লক্ষ করা, তা কখন আসে, কতক্ষণ থাকে, তাপমাত্রা কত পর্যন্ত উঠে, কিভাবে কমে এসব লক্ষ করা ও লিখে রাখা জরুরি। সেই সাথে ঘাম হচ্ছে কিনা, কাপুনি দেয় কিনা তাও লক্ষ করা উচিত। এতে চিকিত্সকের জন্য রোগ নির্ণয় করা সহজ হবে। প্রাথমিকভাবে আমরা ঘরে বসেই আরও যা করতে পারি তা হল পানি দিয়ে শরীর মোছা বা স্পঞ্জ করা। একটি পরিষ্কার তোয়ালে বা গামছা পানিতে ভিজিয়ে নিংড়ে নিতে হবে। এরপর তা দিয়ে সারা শরীর বারবার মুছে দিতে হবে।
প্রয়োজনে মাথায় পানি ঢেলে দেয়া যায়। এভাবে কয়েকবার করলে শরীরের তাপমাত্রা কমে আসবে। মনে রাখতে হবে, এটাই হচ্ছে এ সময়ের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। শরীরের তাপমাত্রা কমোনোর পদ্ধতি। অনেকেই শরীর স্পঞ্জ বা মুছে দেয়ার সময় ঢান্ডা পানি বা বরফ মিশ্রিত পানি ব্যবহার করেন। তা কোন ক্রমেই উচিত নয়। এমনকি এক সময় হাসপাতালে আইসব্যাগ ব্যবহার করে জ্বর কমানো হতো, তা একেবারেই অনুচিত। বরফ শীতল পানি দেয়ার কোন দরকার নেই। স্বাভাবিক পানি বা ট্যাপ ওয়াটার বলেই চলবে।

এক সময় মনে করা হত যে জ্বর হলে ভাত খাওয়া যাবে না। এই ধারনা একেবারেই ঠিক নয়। জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি ভাতসহ সকল স্বাভাবিক খাবার খেতে পারবেন। সেই সাথে প্রচুর পানি খেতে হবে যাতে প্রস্রাব পরিষ্কার থাকে। অনেক সময় প্রচুর ঘাম দিলে শরীর থেকে পানি ও লবণ বের হয়ে যায়। এক্ষেত্রে খাবার স্যালাইন খেতে হবে। প্রয়োজনে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। অনেকের জ্বরে বমি বমি ভাব থাকে বলে ওষুধ খেতে পারেন, সেক্ষেত্রে পায়ুপথে প্যারাসিটামল সাপোজিটরি ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্য ব্যথার ওষুধ না খাওয়াই উচিত। এন্টিবায়োটিক অবশ্যই চিকিত্সকের পরামর্শ ছাড়া খাওয়া উচিত নয়।

অনেকের ধারনা জ্বর হলেই এন্টিবায়োটিক খেতে হবে। এটা ঠিক নয়। কি কারণে জ্বর হয়েছে, জ্বরের পেছনে কি ধরণের জীবানু রয়েছে তার উপরেই নির্ভর করে জ্বরের চিকিত্সা। ভাইরাস জনিত জ্বরে এন্টিবায়োটিকের কোন ভূমিকা নেই, তা এমনিতেই সেরে যায়। শুধু লক্ষণ অনুযায়ী চিকিত্সা দিলেই চলে। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ জনিত কারণে জ্বর হলে সে ক্ষেত্রে যথাযথ এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা দরকার। এমনকি টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া বা যক্ষা হলে তার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। আবার কোলাজেন ডিজিজ বা লিম্ফোমার চিকিত্সা একেবারেই অন্য রকম। তাই সকল চিকিত্সাই চিকিত্সকের সঙ্গে পরামর্শ অনুযায়ী নেয়া উচিত।

শিশুদের জ্বর হলে যে কোন বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন আরো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। সেটাই স্বাভাবিক। অনেক সময় ডাক্তারের কাছে না গিয়ে নিজেরাই এন্টিবায়োটিক শুরু করে দেন। তাও অনুচিত। ঘরে বসেই উপরের করণীয়গুলো নিজেরাই করবেন। আর দ্রুত ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হওয়াই বাঞ্চনীয়। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের বেলায় জ্বরের সাথে খিচুনি উঠে। এক্ষেত্রে শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিত্সা নিতে হবে।
অ্যালার্জি জাতীয় বা সর্দি জ্বর –বা হে ফিভার এবং কমন কোল্ড ফিবার বা রাইনো ভাইরাস জাতীয় জ্বর – (চলবে)

Influenza (Flu)

What is influenza (flu)?

Influenza (or flu) is a highly contagious viral respiratory tract infection. About 5% to 20% get the flu each year. Influenza usually comes on abruptly, with fever, muscle aches, sore throat, and a nonproductive cough.
Influenza can make people of any age ill. Although most people are ill with the flu for only a few days, some have a much more serious illness and may need to be hospitalized. Influenza can also lead to pneumonia and death.
Influenza viruses are divided into three types, designated as A, B, and C:
Influenza types A and B cause epidemics of respiratory illness that occur almost every winter and often lead to increased rates for hospitalization and death. Public health efforts to control the impact of influenza focus on types A and B.
Influenza type C usually causes either a very mild respiratory illness or no symptoms at all. It doesn’t cause epidemics and doesn’t have the severe public health impact that influenza types A and B do.
Influenza viruses continually change (mutate). This helps the virus to evade a person’s immune system. Because the virus changes, people can get the flu no matter what their age. The process works like this:
A person infected with an influenza virus develops antibodies against that virus.
The virus changes.
The “older” antibodies no longer recognize the “newer” virus.
The person becomes infected again.
The older antibodies can, however, give some protection against getting the flu again.
Currently, three different influenza viruses circulate worldwide: two type A viruses and one type B virus. Vaccines given each year to protect against the flu contain the influenza virus strain from each type that is expected to cause the flu that year.
What are the facts about the flu?
Although each flu season is different, 5% to 20% of the population will get the flu each year. Of those who get the flu, between 3,000 and 49,000 will die from it or from complications, with more than 90% of deaths occurring in people over 65.

What causes influenza?

The influenza virus is generally passed from person to person through the air – when an infected person sneezes or coughs. But the virus can also live for a short time on objects like doorknobs, pens, pencils, keyboards, telephone receivers, and eating or drinking utensils. So, you can also get the flu by touching something that has been handled by someone infected with the virus and then touching your own mouth, nose, or eyes.

What are the symptoms of the flu?

The following are the most common symptoms of the flu. But each person may experience symptoms differently. Influenza is called a respiratory disease, but the whole body seems to suffer when a person is infected. People usually become acutely ill with several, or all, of the following symptoms: High fever–Headache–Runny or stuffy nose–Sneezing at times-Cough, often becoming severe–Severe aches and pains–Fatigue for several weeks–ometimes a sore throat–Extreme exhaustion
Fever and body aches usually last for 3 to 5 days, but cough and fatigue may last for 2 weeks or more. Although nausea, vomiting, and diarrhea may happen with the flu, these gastrointestinal symptoms are rarely prominent. Stomach flu is an incorrect term sometimes used to describe gastrointestinal illnesses caused by other microorganisms.

The symptoms of the flu may resemble other medical conditions. Always consult your doctor for a diagnosis.

What is the treatment for influenza?

Specific treatment for influenza will be determined by your doctor based on:Your age, overall health, and medical history-xtent and type of influenza, and severity of symptoms–How long you've had symptoms –

Your tolerance for specific medications, procedures, or therapies-Expectations for the course of the disease–

opinion or preference

The goal of treatment for influenza is to help prevent or decrease the severity of symptoms. Treatment may include:

Medications to relieve aches and fever. Aspirin should not be given to children with fever without first consulting a doctor. The drug of choice for children is acetaminophen.

Medications for congestion and nasal discharge

Bed rest and increased intake of fluids

Antiviral medications. When started within the first 2 days of treatment, they can reduce how long you'll have the flu, but they can't cure it. Some side effects, such as nervousness, lightheadedness, or nausea, may result from taking these medications. People with asthma or chronic obstructive pulmonary disease may not be able to take certain of these medications. Viral resistance to these drugs may vary. Some drugs may be ineffective if current viral strains have developed resistance. All of these medications must be prescribed by a doctor.

Who should not be immunized against the flu?

People who are allergic to eggs may be told not to get the vaccine

People who have had a severe reaction in the past after getting the flu vaccination

People who are sick with a fever (these people should get vaccinated after they have recovered)

Babies who are 6 months old or younger

People who have a history of Guillain-Barré syndrome, a severe paralyzing illness, after getting the flu vaccination

When should I get a flu shot?

The CDC recommends getting the flu shot every year, as soon as it becomes available in your community. Flu season can begin as early as October and most commonly peaks in the U.S. in January or February, but flu seasons are unpredictable. The flu shot takes 1 to 2 weeks to become effective.

Although there are many new medications designed to treat flu symptoms and even shorten the duration of the illness, the flu vaccine still offers the best protection against the flu.

If I get the flu shot, can I still get the flu?

Every year, the flu shot cocktail changes to combat the current strains of influenza affecting the population. The World Health Organization monitors flu outbreaks worldwide and recommends appropriate vaccine compositions to be used for the next year. But sometimes a strain may appear that was not included in the flu vaccine. People who have had the flu shot tend to have milder symptoms if they contract the flu.

Is traveling safe during the flu season?

Because the flu is a highly contagious infection usually spread by droplets made by an

infected person who is coughing or sneezing, travelers are very susceptible to getting the flu. The CDC recommends that travelers have the flu vaccine at least 2 weeks before planned travel to allow time to develop immunity. Other antiviral drugs are available to help prevent viral infections and complications. Consult your doctor for more information.

(Reference last update verssion 2011 and lateset update 08/08/2014 – Virology research jhons hopkins & Medical school uno of bristol)

CATEGORIES স্বাস্থ্য ও জিবন • TAGS তা হলে পরবর্তী বছরে ১০০% নিশ্চিত ইনফ্লোয়েঞ্জা জাতীয় জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার স�, যারা বারে বারে ফ্লো জ্বরে আক্রান্ত হন তারা যদি ১০ মাস আগে ফ্লো ভ্যাকসিন নিয়ে

কৃমি বা Worm (Helminths)

PUBLISHED ON *August 29, 2014August 29, 2014 by Health (স্বাস্থ্য) -4 Comments*

i
4 Votes

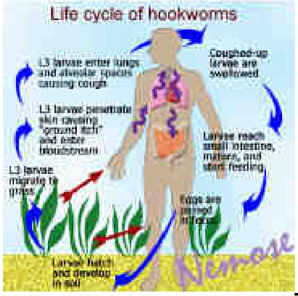

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/w-1.png)

Supporting Research From :– Merck Research Laboratories:1545-1555.- Schistosomiasis Research Group, Bristol (http://www.sanger.ac.uk/research/initiatives/globalhealth/research/helminthgenomes/ (http://www.sanger.ac.uk/research/initiatives/globalhealth/research/helminthgenomes/)) & icddr,b Dhaka (Created by Dr.H.Kamaly – 2013)

কৃমি হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে ক্ষতিকর ও বৃহত্ পরজীবী। এটি মানুষের দেহে বাস করে এবং শরীর থেকে খাবার গ্রহণ করে বেঁচে থাকে ও বংশ বৃদ্ধি করে। তবে শিশু কিশোরদের মাঝে কৃমির সংক্রমণ বেশি দেখা যায়। অবশ্য ছোট শিশু যেমন – পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত, যখন শুধু মাত্র মায়ের বুকের দুধই পান করে, তখন সাধারণত কৃমি হয় না। সাউথ এশিয়ান দেশের মানুষের সুতা কৃমি, কেঁচো ও হুক কৃমির সংক্রমণ বেশি দেখা যায় – তার মুল কারন পরিবেষ এবং জলবায়ু।
যে সব কৃমি মানুষের খাদ্যনালীতে পরজীবী হিসেবে বাস করে সেগুলোর মধ্যে প্রধান হল—কেঁচো বা গোল কৃমি (round worm), বক্র কৃমি (hook worm), সুতো কৃমি (thread worm), চাবুক কৃমি (whip worm), ফিতে কৃমি (tape worm)।

কেঁচো বা গোল কৃমি গোল কৃমি Round worms or nematodes :
এরা সাধারণত মানুষের অন্ত্রে বসবাস করে এবং দেখতে কেঁচোর মতো এবং এই কৃমির রঙ হালকা হলুদ হয়ে থাকে যা পরিণত অবস্থায় ৬ থেকে ১৪ ইঞ্চি লম্বা হতে দেখা যায়।
কিভাবে মানুষ কে আক্রমন করে ঃ-

সাধারণত অপরিষ্কার শাকসবজি ফলমূল, নোংরা খাবার, দূষিত পানির মাধ্যমে কেঁচো কৃমির ডিম আমাদের মুখে প্রবেশ করে অথবা আক্রান্ত ব্যাক্তির কাপড় চোপর, হাত-পা ঠিকমতো না ধুলে নখের মধ্যে বা আঙুলের ভাঁজে লেগে থাকা ডিম খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের পেটে চলে যায়। সেখান থেকে খাদ্যনালীর ক্ষুদ্রান্তে এ ডিম চলে যায় এবং ক্ষুদ্রান্তের এনজাইম বা পাচকরসের মাধ্যমে ডিম থেকে লার্ভা বের হয়। লার্ভাগুলো রক্তের মাধ্যমে যকৃত, হৃদপিণ্ড এবং ফুসফুসে প্রবেশ করে। এরপর ফুসফুসের এলভিওলাই ছিদ্র করে শ্বাসনালী দিয়ে অন্ননালী পার হয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে ক্ষুদ্রান্ত্রে এসে পূর্ণতা লাভ করে এবং ডিম পাড়ে।
একটা স্ত্রী কৃমি দৈনিক প্রায় ২ লাখ ডিম পারে মানুষের অন্ত্রে এবং ১০-৪০ দিনের মধ্যে ডিমের ভেতর বাচ্চা কৃমি তৈরী হয় এবং পরে তা মলের সাথে নিষ্কাশন করে , আবার পুনরায় সেই মল থেকে খাদ্য বা অন্যান্য পর্যায়ে সুস্থ মানুষের পেটে ঢোকে পরে (Foeco-oral route)। এতে শিশুরাই এর বেশি শিকার হয়ে থাকে।
সাধারণত কেঁচো কৃমির সংক্রমণে অনেক সময় প্রথম দিকে কিছু বোঝা যায় না কিন্তু ধীরে ধীরে নানা রকমলক্ষণ দেখা দেয় ঃ
অন্ত্রে বেশি কেঁচো কৃমি থাকলে অস্বস্তিভাব, পেটফাঁপা, পেট ফুলে ওঠা, বদহজম, ক্ষুধামন্দা বা অরুচি, বমি বমি ভাব, ওজন কমে যাওয়া, পাতলা পায়খানা, আমমিশ্রিত মল, শুকনো কাশি, শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, যকৃত প্রদাহ ইত্যাদি হতে পারে।
দুর্ভাগ্য বশত ৩% বেলায় মারাত্মক যে সমস্যা হতে পারে ঃ-
(নিচের সমস্যা হওয়ার আগে ৯৫% বেলায় এর আগে দু একটি কৃমি মুখ বা পায়খানা দিয়ে বাহির হয়ে আসতে দেখা যায় বিধায় সাথে সাথে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিলে জটিল সমস্যা থেকে ১০০% রেহাই পাওয়া সম্বভ বা ভয়ের কিছু নাই – বিশেষ করে শিশুদের বেলায় তার মা বাবাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে)
যে কোন সময় পিত্তনালীতে গিয়ে নালী বন্ধ করে দিতে পারে
অগ্ন্যাশয় নালীতে গিয়ে নালী বন্ধ করে জন্ডিসের লক্ষণ দেখা দিতে পারে
এপেন্ডিসে গিয়ে আটকে যেয়ে এপেন্ডিসাইটিস এর সৃষ্টি করতে পারে।
অন্ত্রে বেশী কৃমি থাকলে কৃমি গোলা বেধে খাদ্যনালীর ভেতরটা বন্ধ করে দিতে পারে বা ক্ষুদ্রান্ত্রের দেয়াল ছিদ্র করে

রক্তনালী বেয়ে লিভার, হৃদপিণ্ড, শ্বাসনালী, খাদ্যনালী হয়ে আবার ক্ষুদ্রান্ত্রেই এসে পৌঁছাতে ও দেখা যায় । (যা করতে মাস দুয়েক সময় লাগে) ।
কৃমির কারণে শরীরে ভিটামিন 'এ' কম শোষিত হয়, ফলে ভিটামিন 'এ'র অভাবজনিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন ত্বক, অন্ত্রের অ্যাপিথেলিয়াম ও চোখের ক্ষতি হয়।
কদাচিৎ এমন ও দেখা গেছে, কেঁচো কৃমির বাচ্চা ফুসফুসে থাকার সময় কাশি, শ্বাসকষ্ট অথবা বড় কেঁচো কৃমি কখনও কখনও বমির সঙ্গে বেরিয়ে শ্বাসনালীতে ঢুকে মৃত্যুর কারণ হতে পারে- (এই সব ক্ষেত্রে জরুরী অপারেশন ছাড়া আর কোন ব্যাবস্থা নাই- রোগীকে বাঁচানোর জন্য ।
যদি ভালভাবে নিশ্চিত না হতে পারেন তা হলে আপনার চিকিৎসকের পরামর্ষে নিচের পরীক্ষা করে নিতে পারেন ঃ- পায়খানা , প্রস্রাব এবং রক্ত পরীক্ষা করে কৃমির ডিমের উপস্থিতি সনাক্ত করন অথবা সাথে আল্ট্রাসাউন্ড বা এক্সরে করে নিতে পারেন ।

চিকিৎসা ঃ-

সাধারণত সন্দেহ মুক্ত থাকার জন্য প্রত্যেকের ই প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর এক ডোজ মেবেন্ডাজল গ্রোফের ঔষধ খাওয়া ভাল এবং কৃমির মারাত্মক উপদ্রব না থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শের তেমন প্রয়োজন নেই । (তবে বুকের দুধ সেবন কারী শিশুর প্রয়োজন হয়না এবং গর্ভ বতি মায়ের জন্য কৃমি নাশক ঔষধ সেবন সম্পূর্ণ নিষেধ) –
অনুরোধ থাকবে নিচের বিষয় সমূহ খেয়াল রাখার (যারা বারে বারে কৃমি জনিত অসুখে ভোগেন তাদের জন্য)
আরেক টি বিষয় মনে রাখতে হবে কৃমি দারা আক্রান্ত ব্যাক্তিরা অনেক সময় এক ডোজ ঔষধ সেবন করার পর মনে করেন কৃমি চলে গেছে সেই ধারনা ও ভুল কেন না কৃমির ঔষধ শুধু কৃমি কে পেরালাইস অথবা ধংশ করে বাহির করে দেয় কিন্তু তার ডিম কে নস্ট করতে পারেনা বরং অন্ত্রের ভিতর থেকে যায় আর ১৪ থকে ৫৯ দিন, তাই পুনরায় ১৪ দিন পর এবং তিন মাস পর আরেক ডোজ ঔষধ খেলে আসা করা যায় সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারবেন এতে কোন সন্ধেহ নাই , তারপর ও আপনার চিকিৎসকের পরামর্ষে ব্যাবস্থা গ্রহন করবেন ।
যদি কৃমির উপদ্রব বেশি হয়ে যায় মনে করেন এবং সেই সাথে পেটে তিব্র ব্যাথা ও রক্ত যাওয়ার মত লক্ষণ থাকে তা হলে অবশ্যই পেটের ব্যাথা আগে কমানোর ব্যাবাস্থা করবেন (চিকিৎসকরা হাইসোসিন বা ঐ জাতীয় গ্রোফের ঔষধ দিয়ে আগে পেটের ব্যাথা নিয়ন্ত্রণ করেন) , নতুবা কৃমি অন্ত্রের ভিতর প্যাঁচালো গুটির মত কিছু তৈরি করে ভিন্ন ইনফেকশন বা ছিদ্র থাকলে অন্ত্র ছিড়ে যেতে পারে অথবা কৃমি বেশি থাকলে অন্ত্রের ভিতর পেঁচিয়ে ম্যাস তৈরি করে নিতে পারে ।
চিকিৎসকরা যে সকল ঔষধ সেবনের পরামর্ষ দিয়ে থাকেন ঃ- (কৃমির ঔষধ খাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ যাদের – গর্ভবতী মহিলা, জ্বর ও ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী)
মেবেন্ডাজল (mebendazole) – ১ টা করে দিনে দুই বার তিন দিন — অথবা লিভামিজল (levamisole) – this is an alternative tablet to mebendazole, which you take in a single dose অথবা পাইপেরাজিন (piperazine) – (this medicine comes as a sachet of powder that you stir into milk or water) এই ঔষধ টি এক ধরণের পাউডার জাতীয় বিধায় পানি বা দুধের সাথে মিশিয়ে খেতে হয় অথবা ট্যাবলেট হিসাবে চার গ্রাম একটি বড়ি খেতে হয় । (সবচেয়ে ভাল Almax ট্যাবলেট । প্রথম ডোস হলো ১ পিস , এর ১ সপ্তা পর আর একটা, এর ৩ মাস পর রেগুলার একটা করে খেতে পারেন)
শিশুদের বেলায় মেবেনডাজল সিরাপ-চা-চমচের ১ চামচ করে দিনে ২ বার মোট ৩ দিন খেতে দেয়া যেতে পারে । (মায়ের বুক সেবন কারীদের বেলায় এই সব ঔষধ ব্যাবহারের অনুমতি দেওয়া হয়না)

ভেষজ ঃ- (AFR @drkamaly)

ভেষজ ঔষধির এখন পর্যন্ত সরা সরি কৃমির জন্য ১০০% কার্যকর ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি, তবে সাপ্লিমেন্টরি হিসাবে অনেক ভেষজ উপকারী ইহা সত্য । (হারবাল রিসার্চ ইউকে) তারপর ও এখন পর্যন্ত যে সকল ভেষজ বৈজ্ঞানিক ভাবে কিছু টা কার্যকর আমি নিম্নে তা তুলে দিলাম (চিরতা, আফিম এই সেই গ্রামীণ জনপদে, মুখে মুখে বললেও বৈজ্ঞানিক ভাবে এই সব কৃমির জন্য কার্যকর বলে মনে করা হয়না- তাই আগেকার এই সব কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে, যেহেতু চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি সেকেন্ডে বদল হতে পারে) ঃ-
হলুদ (Curcuma longa) ঃ- 300 মিলিগ্রাম দিনে তিনবার, (টেস্ট হিউম্যান হেলথ রিসার্চ অনুসারে ইহা প্যারাসাইট রোধক হিসাবে ৭.৯৭% কার্যকর .সে জন্য মানুষের প্যারাসাইট জাতীয় কৃমিতে কাজ করে বলে প্রমাণিত) তবে মনে রাখতে হলুদ রক্তপাতের ঝুঁকি বাড়াতে পারে যেভাবে এসপিরিন বা warfarin (coumadin) রক্ত পাতলা করে রক্তপাত ঘটায় অতবা যাদের রক্তের জমাট বাধার ক্ষমতা কম তাদের জন্য ব্যাবহার নিষেধ –
রসুন (Allium sativum), দুই থেকে তিন বার দৈনন্দিন 400 মিলিগ্রাম করে প্রতিদিন,(টিউবিং ফর্মুলা অনুসারে প্রাণীদের প্যারাসাইটে ভাল কার্যকর , কিন্তু ইহা মানুষের মধ্যে কার্যকর কিনা এখনো কোনো সুস্ট প্রমান দেওয়া সম্বভ হয়নাই) তারপর ও অন্ত্রের আলসার বা ঘা জাতীয় কোন অসুখ থাকলে তা খাওয়া ঠিক না ।

অয়ারম্যুড (Wormwood / absinthium) বা কালো আখরোট (Juglans nigra), এবং লবঙ্গ (লবঙ্গ) দুটি এক সাথে পরজীবী সংক্রমণের জন্য খুভি চমৎকার ফলদায়ক – সমন্বয় ভেষজ সূত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয় বা ভাল কার্যকর একটি যৌগ ঔষধ (গর্ভবতীদের বেলায় সেবন নিষেধ)

সুতা কৃমি বা গুঁড়া কৃমি thread worm /pinworms :
এগুলো সুতার মত, ছোট, পাতলা এবং সাদা রঙের হয়। সুতা কৃমি ২ থেকে ১২ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের সাদা সুতার মতো চিকন। খাবারের সাথে পেটে গিয়ে সুতা কৃমি ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থান করে কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক সুতাকৃমিদের বৃহদন্ত্রের কোলনেই বেশি পাওয়া যায় এবং স্ত্রী কৃমি ডিম পাড়ার জন্য রাতে মল দ্বারে বেরিয়ে আসে এবং সেখানে প্রচুর -রিপমিউসিন — জেলি জাতীয় পদার্থ নিঃসরণ করে বিধায় চুলকানি দেখা দেয় । পুরুষ কৃমি স্ত্রী কৃমির চেয়ে ছোট । একসঙ্গে ডিম পাড়ে ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার! ডিম থাকে পায়ুপথের মুখের কাছে এবং পায়ুপথের আশপাশের ত্বকে । এ ছাড়া, ডিম পাড়ার প্রয়োজনে আসা স্ত্রী কৃমির নড়াচড়ার জন্য পায়ুপথে ও পায়ুপথের আশপাশে সুড়সুড়ি অনুভূত হয়। চুলকানি ও সুড়সুড়ির জন্য রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। চুলকানির সময় কৃমির ডিম লেগে যায় হাতের আঙ্গুলে, ঢুকে যায় নখের নিচে। খাওয়ার সময় বা সেই হাত কোনোভাবে মুখের সংস্পর্শে এলে ডিমগুলো মুখের মধ্য দিয়ে খাদ্যনালিতে প্রবেশ করে। সেখানে ডিম ফুটে বাচ্চা হয় । বাচ্চা কৃমি ডিম দেওয়ার উপযোগী বড় হতে সময় নেয় প্রায় দেড় থেকে দুই মাস । এ ডিমগুলো বেঁচে থাকতে পারে প্রায় দুই সপ্তাহ। পরিবারে একজন মাত্র আক্রান্ত হলে অন্যান্য সবাই আক্রান্ত হতে পারেন বিধায় সকলের এক সাথেই কৃমি না থাকলে ও ঔষধ খাওয়া উচিৎ এবং আক্রান্ত ব্যাক্তির কৃমি পুনরাবৃত্তি না হওয়ার জন্য দুই সপ্তাহ পর আবার ঔষধ খাওয়া উচিৎ কার কারও বেলায় ৫৯ দিন পর আরেক ডোজ ঔষধ খাওয়া ভাল ।
লক্ষণ হিসাবে মলদ্বারে প্রচন্ড চুলকানি, বা ঘা দেখা দিয়ে থাকে – শিশুদের বেলায় রাতে ঘুমের মধ্যে দাত কাটা বা মুখ থেকে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা বাহির হতে পারে । মহিলাদের বেলায় পায়ুপথ ছাড়া ও যৌন নালির আশে পাশে চুলকানি দেখা দিয়ে থাকে অথবা যে সব মহিলারা সাদা স্রাব জাতীয় অসুখে ভোগেন তাদের বেলায় সেই অসুখ আরেকটু বেশি বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় – এ ছাড়া দীর্ঘ দিন ভোগলে পায়ু পথের ইনফেশনের কারণে পাইলস বা ঐ ধরণের অসুখ হওয়ার সম্বাভনাই বেশি থাকে —
মাত্রা অতিরিক্ত সুতা কৃমি দ্বারা কি পরিমাণ ইনফেকশন হয়েছে তা বুজার জন্য পায়ু পথের টেপ টেস্ট করাতে পারেন, যা প্যাথলজিস্ট রা করে থেকেন –
চিকিৎসা ঃ-
সুতা কৃমির ঔষধ হিসাবে মেবেন্ডাজল এবং পিপারজিন গ্রোফের ঔষধ এখন পর্যন্ত ভাল একটি কার্যকারী ঔষধ । তবে প্রথম সিঙ্গেল ডোজ ঔষধ খাওয়ার পর ১৪ নাম্বার দিনে পুনরায় আরেক্ট ডোজ খেতে ভুলবেন না । যদি পায়ু পথ ঘা হওয়ার সম্বাভনা থাকে তা হলে জিঙ্ক অথবা মাইল্ড এন্টিবায়োটিক ক্রিম ব্যাবহার করতে হবে ।
প্রতিরোধ ঃ-
পানি, বিভিন্ন খাবার-দাবার, কাঁচা শাক-সবজির মাধ্যমে এ রোগের ডিম আমাদের অন্ত্রে প্রবেশ করে বিধায় ঐ সব খাবার খাওয়ার সময় ভাল করে ধোয়ে খেতে হবে (সদ্য এক গবেষণায় দেখা গেছে, কিছু সবজি জাতীয় তরকারি, আমরা বাজার থেকে কিনে এনে ভাল করে ধোয়ে খাওয়ার পর ও জিয়ারডিয়েল ট্র্যাক্ট সহ কৃমি দারা আক্রান্ত হই , যেমন কাচা মরিচ , কারন হিসাবে দেখানো হয়েছে ঐ জাতীয় তরকারির বিচির মধ্যেই পেরাসাইট বসবাস করে থাকে, যা আমরা দেখতে পাইনা বা অনেক সময় ধোয়ার পর ও ভিতরে থেকেই যায় , তাই ঘন ঘন যে পরিবার কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তাদের বেলায় চেস্টা করবেন ফ্রেশ তরিতারকার ভাল করে রান্না করে খাওয়ার, বিশেষ করে এশিয়ান অঞ্চলে শিত কালের তরিতরকারিতে একটু বেশি দেখা দিয়ে থাকে বিধায় , শীত কালেই সুতা কৃমি বেশি হয়ে থাকে যে কোন বয়সের মানুষের তবে শিশুদের একটু বেশি)
ব্যাক্তিগত পরিচ্ছন্নতা হিসাবে সকলের যা করা উচিৎ ঃ-
খাওয়ার আগে ও পায়খানার পরে ভালোভাবে হাত ধোয়া, হাতের নখ ছোট ও পরিষ্কার রাখা, দাঁতে নখ কাটার অভ্যাস গড়ে না তোলা, পায়ুপথ বা এর আশপাশের ত্বকে চুলকানো বন্ধ করা, প্রতিদিন পরিষ্কার অন্তর্বাস পরিধান করা, বিছানার চাদর, পরনের প্যান্ট ইত্যাদি প্রতিদিন পরিষ্কার করা

বক্র কৃমি (hook worm),ঃ- (আমি ব্যাক্তি গত ভাবে একে রক্ত চোষা পেরাসাইট বলি)
এ জাতীয় কৃমির মুখে হুক বা বড়শির মতো চারটি দঁাত রয়েছে এবং ২ থেকে ৬ ইঞ্চি লম্বা সবুজাভ-সাদা রঙের হয়ে থাকে। বক্রকৃমির ডিম মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে পরে আর্দ্র, ভেজা মাটিতে লার্ভায় পরিণত হয় এবং সংক্রমণ করার উপযুক্ত হয়।
মাটিতে বা ঘাসে লেগে থাকা বাচ্চা কৃমি (লার্ভা) সাধারণত পায়ের তলার চামড়া ফুটো করে শরীরে প্রবেশ করে এবং ফুসফুসে থেকে শ্বাসনালী হয়ে অন্ননালীর ক্ষুদ্রান্ত্রে এসে পূর্ণতা পায় এবং অনবরত ডিম পাড়ে।এতে ৪-৫ দিন সময় লাগে ।
কিভাবে এই কৃমি সংক্রামিত হয় ঃ– পায়খানার সঙ্গে এই কৃমির ডিম মাটিতে মেশে। ভিজা মাটিতে ৭-১০ দিনের মধ্যে ডিম থেকে বাচ্চা কৃমি ফোটে। তারপর মানুষের পায়ের পাতায় গর্ত ওরা ঢোকে পরে শরীরে এবং পরে তা

রক্তনালীর মাধ্যমে ফুস্ফুস থেকে সবাশ নালী হয়ে ক্ষুদ্রান্তে চলে আসে এবং এখানেই এরা বড় কৃমিতে পরিণত হয় এবং হুকের মত দাঁতের সাহায্যে ক্ষুদ্রান্ত্রে লেগে থাকে এবং সেখানেই অন্ত্রনালির রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে । গড়ে ১০০ বক্র কৃমি দৈনিক গড়ে ২০-৩০ মি.লি. রক্ত চুষে থাকে, অন্যদিকে এক একটি বক্র কৃমি দৈনিক গড়ে ২০ হাজারের মত ডিম পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে এ জাতীয় কৃমি ২/৩ বছর পর্যন্ত বেচে থাকতে দেখা যায় । মানুষের পায়খানার মাধ্যমে এই সব কৃমির ডিম ঘাস, লতা পাতা বা মাটীতে পরার ৭/১০ দিনের ভিতর আবার মানুষের পায়ের পাতা দিয়ে ঢোকার চেস্টা করে ।

লক্ষণ ঃ– প্রধানত রক্তক্ষয় জনিত দুর্বলতাই বেশি প্রকাশ পায় । রক্ত স্বল্পতা বা এনিমিয়ার শিকার হয়। চোখ-মুখ ফ্যাকাশে দেখায়, হাত-পা ফোলে, বুক ধড়ফড় করে, শ্বাসকষ্টও হতে পারে। কখনও পেটে অস্বস্তি, উদরাময় দেখা দেয় – অথবা কার ও বেলায় বুক ও পেটের ব্যথা, বমি অনেকটা পেপটিক আলসার রোগের মতো মনে হয়। এছাড়া রক্তমিশ্রিত কাশি, আমিষের অভাব , এমনকি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হতে পারে রক্ত শূন্যতার কারণে । এসব বক্রকৃমি পায়ের তালু ফুটা করে শরীরে প্রবেশ করে বিধায় পায়ের তালু ফুটা করার করণে পায়ের তালুর ত্বকে ইনফেকশন দেখা দেয় এবং পায়ের তালুতে ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি হতে দেখা যায় অনেকের (তবে যারা বেশি খাবার বা প্রচুর আয়রন জাতীয় খাবার খেয়ে থাকেন তাদের বেলায় এ সব লক্ষণ অনেক দেরিতে ধরা পরে) ।

কাদের বেশি আক্রমনের সম্বাভনা ঃ– যারা খালি পায়ে টয়লেটে, রাস্তায়, মাঠে ঘাটে চলা ফিরা করেন তাদের । সেই হিসাবে গ্রামের শিশুরা এই কৃমির দ্বারা আক্রান্ত একটু বেশি হয়ে থাকে, কারন সেখানে অনেক অঞ্চলেই মাঠে ঘাটে মলত্যাগের প্রবণতা বেশি তাই ।

চিকিৎসা ঃ– পেরাসাইট (কৃমি) নস্ট করার জন্য সমান ভাবেই উপরে বর্ণীত চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাবাহার করা হয়ে থাকে তবে অতিরিক্ত রক্ত শূন্যতা ও পুস্টির অভাব জনিত অন্যান্য বিষয় সমূহ লক্ষণের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসকরা চিকিৎসা করে থাকেন ।

চাবুক কৃমি বা Whip worms—

এই কৃমি লম্বায় এক থেকে দেড় ইঞ্চি, রঙ গোলাপী বা ধূসর। কৃমির ডিম মলের সঙ্গে বেরিয়ে খাবার-পানীয়ের মাধ্যমে শরীরে ঢোকে। বক্র কৃমির মত অন্ত্রের দেওয়াল থেকে রক্ত চোষে চাবুক কৃমিও, তবে পরিমাণে কম।

এই কৃমি সংক্রমণে অপুষ্টি, রক্তাল্পতা হতে পারে।

ফিতা কৃমি tape worm :

ইহা দেখতে ফিতার মতো দীর্ঘ আকারের, ৫ থেকে ৩৩ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ছোট মাথার সঙ্গে অসংখ্য চেপ্টা খণ্ড (শসার বীচির মতো) একটির সঙ্গে আরেকটি যুক্ত হয়ে এ কৃমির দেহ গঠিত হয়। সাধারণত পেটে একটি মাত্র ফিতাকৃমি থাকে তবে বেশিও থাকতে পারে। ফিতা কৃমি ক্ষুদ্রান্ত্রে ডিম পাড়ে। মানুষের মলের সঙ্গে বেরিয়ে ফিতাকৃমির ডিম মাটিতে পড়ে থাকে কিংবা ঘাসে লেগে থাকে। গরু, মহিষ, শুকর মাঠে চরার সময় এ ডিমগুলো খেলে গরু,শুকরের ও মহিষের দেহে লার্ভা প্রবেশ করে এবং সিস্ট হয়ে মাংস পেশিতে বেঁচে থাকে।

মানুষ কে আক্রমণ করে ৬ ধরণের ফিতা কৃমি । এর মধ্যে প্রধান কারঙ্গলো হল , কম সিদ্ধ বা অর্ধ সিদ্ধ গরুর মাংস , শোয়রের মাংস এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কম সিদ্ধ মাছ থেকে এই জিবানু নস্ট না হয়ে সরা সরি ক্ষুদ্রান্ত্রে বাসা বাঁধতে দেখা যায় এবং সেখানে মাথায় থাকা দাঁত দিয়ে কৃমি অন্ত্রের দেওয়াল কামড়ে ঝোলে থাকে। । কিন্তু সবচেয়ে বিপদ জনক বা মারাত্মক শোয়রের মাংস থেকে আগত ফিতা কৃমি । (মুলত সব ধরণের পিতা কৃমি মানুষের মল থেকে ফেলা ফিতা কৃমির লাভা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে মানুষ তা খেয়ে ও আক্রান্ত হয়) অথবা ফিতা কৃমির লাভা বা ডিম অনেক সময় মানুষের মলের সাথে যখন বেরিয়ে যায় এবং যে কোন কারণে ঐ পানি বা তরিতরকারি ও অন্যান্য খাবার গ্রহন করে ও মানুষ আক্রান্ত হয়ে থাকে । অন্ত্রের ফিতাকৃমি দেখতে অনেকটা শসার বিচির মতো মনে হয় যা মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

লক্ষণ হিসাবে প্রথমে তেমন কিছু বুজা যায়না বা ফিতা কৃমি দ্বারা আক্রান্ত্রের অনুভব অনেক বুজতে অনেক সময় ১/২ বছর পর ও ধরা পরে ঃ- তার পর ও খুভ হালকা ভাবে যা দেখা যায় যেমনঃ- – বমি বমি ভাব–দুর্বলতা–ডায়রিয়া–পেটে ব্যথা- ক্ষুধা বা ক্ষুধামান্দ্য–ক্লান্তি–ওজন কমে যাওয়া–শরীরের ভিটামিন এবং খনিজ ঘাটতি ইত্যাদি দেখা দিয়ে থাকে । খুভ কম ক্ষেত্রে পিতা কৃমি অন্ত্রে ব্লক সহ গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি করে.। তবে শুয়োরের মাংস ফিতাক্রিমি ডিম খুভ তাড়া তাড়ি শরীরের অন্যান্য অংশের স্থানান্তর এবং লিভার, চোখ, হৃদয়, এবং মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে. এই সংক্রমণ জীবন হানীর হুমকি হতে পারে । এ ছাড়া ও সিস্ট হয়ে মাংস পেশিতে বেঁচে থাকা ফিতা কৃমি অনেক ধরণের জটিলতার সৃষ্টি করে বা কোন কোন সময় রক্ত প্রবাহের সাথে মস্তিষ্কে ভিতরে গিয়ে ও আক্রমণ করতে পারে , ফলে মাথাব্যথা, খিঁচুনি, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন এমনকি মৃতুযর কারণ হতে পারে।

সাধারণত খুভ কম ক্ষেত্রেই পিতা কৃমির ঠুকরা বাহির না হওয়া পর্যন্ত ধরা পরে কম এবং তখন চিকিৎসকরা তিন মাস পর্যন্ত পায়খানার নমুনা পরীক্ষা করে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত এর শেষ অংশ বাহির না হয় । সেই সাথে মলের ফিতা কৃমির ডিম উপস্থিতির জন্য কালচার বা স্কিন বায়োস্কোপি পরীক্ষা করে থাকেন ।

(CBC, including differential count- Stool exam for eggs of T. solium or T. saginata, or bodies of

the parasite)
ফিতার কৃমির চিকিৎসা সাধারণত praziquantel (Biltricide) গ্রোফের একটা সিঙ্গেল ডোজ ই যথেষ্ট বলে মনে করেন চিকিৎসকরা । সেই সাথে আনুসাঙ্গিক অন্যান্য অসুবিধার জন্য ব্যাবস্তা গ্রহন করা হয়ে থাকে (যেমন রক্ত শুন্যতা, বা ভিটামিনের অভাব থাকলে তা দূর করা)
সামাজিক ভাবে সবাই কে যা বুজানো উচিৎ ঃ- (গ্রামীণ জনপদের জন্য)
গ্রামীণ পর্যায়ে বসবাসরত বেশিরভাগ লোকেরা এখন ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা নেই। এসব লোক কঁাচা পায়খানা ব্যবহার করে এবং নদীতে, খালে, উণ্মুক্ত স্থানে মল ত্যাগ করতে অভ্যস্ত। ফলে পানি ও মাটিতে কৃমির ডিম ছড়িয়ে পড়ে। এসব মাটিতে ও পানিতে উৎপন্ন শাক-সবজি, ফল-মূল কাঁচা খেলে অথবা কৃমির ডিম বাহিত দূষিত পানি পান করলে কৃমির সংক্রমণ ঘটে। এছাড়া খালি পায়ে হাটার ফলে পায়ের নিচ দিয়ে হুকওয়ার্ম বা বক্রকৃমির লার্ভা শরীরে প্রবেশ করে থাকে । অন্য দিকে গৃহপালিত পশু পাখী ও এই আক্রমণের শিকার হয়ে থাকে ।

সর্বশেষ তথ্য ও গবেষণা থেকে প্রমাণিত ঃ- (ডক্টরস অব উইদাউট বর্ডার)
যারা কেঁচো কৃমির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাদের খাবার অরুচি বা অন্ত্রের গোলা যোগ জাতীয় অন্যান্য অসুখ সাধারণ মানুষের চাইতে ৭০% বেশি থাকে – তার কারন হিসাবে দেখানো হয়েছে মানুষের খুভি জরুরী খনিজ রস সমূহ অন্ত্র থেকে কৃমি গুলো চুষে নেয় (ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, দস্তা, এবং সেলেনিয়াম হিসাবে খনিজ ট্রেস) বিধায় শারীরিক পুষ্টিহীনতা জনিত নানান সমস্যা লেগেই থাকে । সে জন্য গবেষকদের মতে আক্রান্ত ব্যাক্তির কৃমি ধংশ করার পর ভাল ভিটামিন ও খনিজ যোক্ত খাবারের দিকে একটু বেশি মনযোগী হওয়ার দরকার (শিশুদের বেলায় খুভ বেশি প্রয়োজন) সে সময় ভিটামিন এ এবং বি৬ ঘাটতি বেশি দেখা দেয় বিধায় মাল্টিভিটামিন ঔষধ সেবন করা সকলের জন্য ভাল – সাউথ এশিয়ান দেশে ২৭% শিশুদের রুচি নষ্ট হওয়া এবং পুষ্টিহীনতারও অন্যতম কারণ কৃমি সংক্রামণ জাতীয় অসুখ ।।

নিউট্রেশনাল ও ডায়েটি বিশেষজ্ঞ, হারবাল বিশেষজ্ঞ এবং ঔষধ বিষয়ক বিজ্ঞানীদের মতে পরোক্ষ ভাবে সম্পূরক হিসাবে – হলুদ (curries) এবং তিক্ত মসলাযুক্ত খাবার, গোলমরিচ , জলপাই, ডুমুর, রসুন, আদা এবং এলাচ, লবঙ্গ – দারুচিনি মশলা যোক্ত গরম চা পান করা ও সামুদ্রিক সবজি বেশ উপকারী । (প্রমাণিত) রিসার্চ ল্যাব — ধন্যবাদ
বহুল প্রচলিত কৃমি সম্পর্কিত ভুল ধারণা বা কুসংস্কার যা মোটেই ঠিক নয় ঃ- (সংগৃহীত)

১. পেটে দু-চারটা কৃমি থাকা ভালো, পেটে কিছু কৃমি না থাকলে খাবার হজম হয় না—অনেকে এসব ধারণা পোষণ করেন। আসলে কৃমি শরীরের শত্রু। এরা দেহের খাদ্য-পুষ্টি-রক্ত শোষণ করে।
২. মিষ্টি খেলে কৃমি হয় এমন কথাও বলেন কেউ কেউ। মিষ্টি খাওয়ার সঙ্গে কৃমি হওয়ার ব্যাপারটি কোনভাবেই যুক্ত নয়
৩. চিরতার পানি অর্থাৎ তেতো খেলে কৃমি মরে যায়, অনেকে এ রকম ভেবে থাকেন। চিরতার অন্য ভেষজ গুণ থাকলেও কৃমি মরার বিষয় প্রমাণিত হয়নি।
৪. কৃমির ওষুধ কেবল শীতের সময় বা বৃষ্টির দিনে খাওয়াতে হয়; গরমের দিনে খাওয়াতে নেই—এ ধারণাও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। এসবের কোনো ভিত্তি নেই। বাজারের কৃমিনাশক ওষুধ সবই মোটামুটি নিরাপদ এবং শীত-গরম যেকোনো সময়ই খাওয়ানো যায়।

CATEGORIES স্বাস্থ্য ও জিবন • TAGS কৃমি বা WORM (HELMINTHS)

স্ত্রী-জনন তন্ত্রের গঠন এবং হরমোন (মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং মেডিক্যাল সাইন্স এন্ড রিসার্চ অনুসারে বর্ণীত) হরমোন পর্ব ৫ (গ) ---

PUBLISHED ON *August 25, 2014January 10, 2017 by Health (স্বাস্থ্য) -Leave a comment*

i
8 Votes

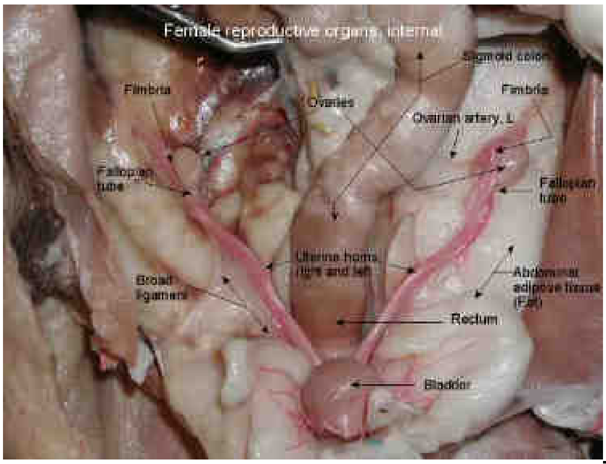

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/pen-4.jpg)

শিক্ষণীয় – ডকুমেন্টারি প্রমাণ্য ভিত্তিক একটি বিষয় যা সদ্য রিসার্চ থেকে নেওয়া হয়েছে – যা থেকে সবাই উপকৃত হবেন বা অনেক অজানা কিছু শিখতে জানতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস – এবং যদি বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এই সব বিষয় সামান্য জেনে রাখেন তাহলে ব্যাক্তিগত পারবারিক জীবনে, পুরুষ – মহিলা- সবাই , কিছু না কিছু উপকৃত হওয়ার কথা – সেই সাথে তরুন – তরুণীরা ও অনেক টা নিজকে সংশোধন করে নিতে পারবে এবং পরোক্ষ ভাবে সামাজিক অপরাধ জাতীয় প্রবণতা ও সত্য কিছু জেনে রাখতে পারবে বলে মনে হয় – সেই কথা মাথায় রেখেই আমার লিখা , কাউকে খুশি করা বা সুনাম অর্জনের জন্য নয় – ধন্যবাদ (ডাঃ হেলাল কামালি)
Reference from:- Dr Domingoঃ- University Hospitals Bristol NHS Trust / University of Manchester / Uni Rochester sex & Education – Alternatives to Human Growth Hormone HGH & sex hormone -Human Sexuality-Sexual Attitude Restructuring & Sexual Pleasure Education Research (Uni of BIU) And few of article from WHO & Bangladeshi Medical proffesors (Created by Dr.Helal Kamaly)

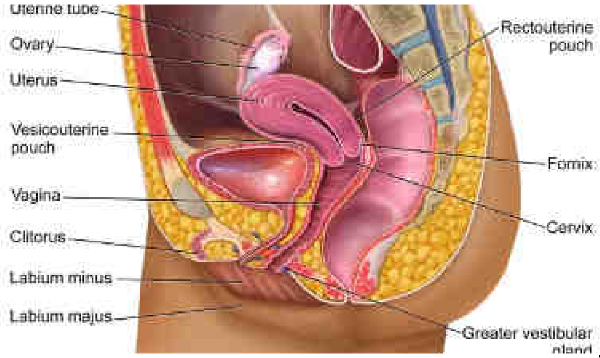

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/ov-2.jpg)

স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র দুটি প্রধান অংশের সমন্বয়ে গঠিত। স্ত্রী জননতন্ত্র প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত করা যায় – বাহ্যিক যৌনাঙ্গ ও অভ্যন্তরীণ যৌনাঙ্গ।
অভ্যন্তরীণ যৌনাঙ্গ ঃ- প্রথম ঃ- জরায়ু, যেখানে ফিটাস বিকশিত হয়, যোনীয় ও জরায়ুজ ক্ষরণ উৎপন্ন হয় এবং পুরুষের শুক্রাণু ফেলোপিয়ান নালিতে পরিবহন করে নিয়ে যায়।
দ্বিতীয় ঃ- প্রধান অংশ হচ্ছে ডিম্বাশয়, যা ডিম্বাণু উৎপন্ন করে। এ সবই শরীরের অভ্যন্তরীন অংশ। যোনি শরীরের বাইরে ভোলভার সাথে যুক্ত যা লেবিয়া, ক্লিটোরিস, এবং মূত্রনালী নিয়ে গঠিত। যোনি, জরায়ুর সাথে সারভিক্স দ্বারা সংযুক্ত; ডিম্বাশয়, উভয় পাশে দুই ফেলোপিয়ান নালির মাধ্যমে জরায়ুর সাথে সংযুক্ত। নির্দিষ্ট সময়ে ডিম্বাশয়, ডিম্বাণু ক্ষরণ করে যা ফেলোপিয়ান নালি হয়ে জরায়ুতে এসে পৌঁছে।

Overy বা ডিম্বাশয় ঃ

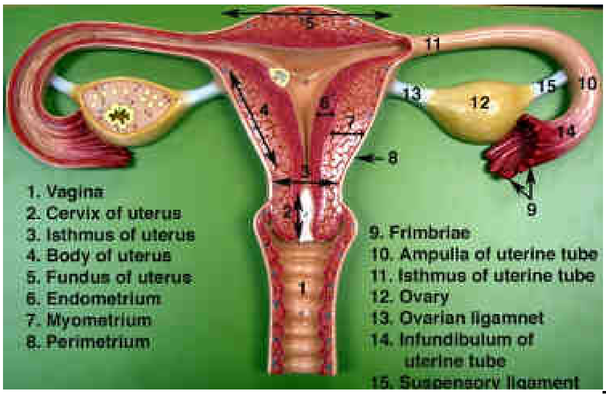

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/ov-1.jpg)
ডিম্বাশয় দেখতে অনেকটা ডিম্বাকার এবং—দৈর্ঘে ৩ সে.মি., প্রস্থে ১.৫ সে.মি., এবং পুরু ১.৫ সে.মি.। (যেকোনো একটির জন্য) শরীরে এর অবস্থান পেলভিস বা শ্রোণীর দেয়াল ঘেষে, যাকে বলা হয় ওভারিয়ান ফসা। সাধারণত ফসার নিচে থাকে বহিঃস্থ ইলিয়াক ধমনী এবং সামনে থাকে মূত্রনালী ও অন্তঃস্থ ইলিয়াক ধমনী। প্রতিটি ডিম্বাশয় ফেলোপিয়ান টিউবের ফিম্‌ব্রিয়ার সাথে যুক্ত।ইহা একজোড়া করে থাকে। সাধারণত প্রতিটি ডিম্বাশয়ই প্রতি মাসে ডিম্বক্ষরণ করে। কিন্তু কারণবশত, একটি ডিম্বাশয় না থাকলে বা কাজ না করলে অপর ডিম্বাশয়টি ডিম্বক্ষরণ চালিয়ে যেতে থাকে।

স্ত্রী প্রজননকাল শুরু হয় ১২ -১৫ বৎসরের ভিতরে এবং স্থায়ী থাকে ৪৫ বৎসর পর্যন্ত (গড়ে এশিয়ান মহিলাদের ৩৪ বয়স পর্যন্ত) এই সময়ের ভিতরে ডিম্বাশয় থেকে গ্রাফিয়ান ফলিকল (ডিম) উৎপন্ন হয় তার সারা জিবনে প্রায় ৪৫০টি। এরপর নারীর প্রজনন ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায় । ওভারি প্রথম সন্তান জ্নদানের পর আর কখনো আগের অবস্থায় ফিরে যায় না। জন্মগত ত্রুটি হিসেবে ডিম্বাশয় না থাকলে ঋতুস্রাব হবে না, গর্ভধারণও হবে না কিন্তু একজন নারী বেঁচে থাকবে। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বস্থলন হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে ওভুলেশন বা ডিম্ব পরিস্ফুটন প্রক্রিয়া । ডিম্বাশয় পুরুষের শুক্রাশয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এতে গোনাড ও অন্তঃক্ষরা উভয় প্রকার গ্রন্থি-ই রয়েছে। ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন গ্রাফিয়ান ফলিকল ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বনালীতে আসে। এই সময় গ্রাফিয়ান ফলিকল-এর একটি অংশ ডিম্বাশয়ে থেকে যায়। থেকে যাওয়া এই অংশটির রং হলুদ। একে বলা হয় করপাস লুটিয়া (Corpus lutia)। এর কোষগুলো ইস্ট্রোজেন (Estrogen) এবং প্রোজেস্টেরন (Progesteron) নাম দুটো স্ত্রী হরমোন নিঃসরণ করে। ইস্ট্রোজেন-এর প্রভাবে ফলে গর্ভকালীন সময়ে নারীর স্তনকে পুষ্ট ও বৃদ্ধি করে। একই সাথে জরায়ুর আকার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে প্রোজেস্টেরন জরায়ুর ভিতরে ভ্রণের পূর্ণ বিকাশের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে। (বিস্থারিত যৌন রোগ অধ্যায়ে জানতে পারবেন) অর্থাৎ ডিম্বাশয় দুটি ই শরীরের প্রধান দুইটি কাজ করে , প্রথমত oocytes (ডিম) উৎপাদন করা দ্বিতীয়ত প্রজনন হরমোন উৎপাদন করা (ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন)

ডিম্বাণু (Egg Cell or Ovum) ঃ-

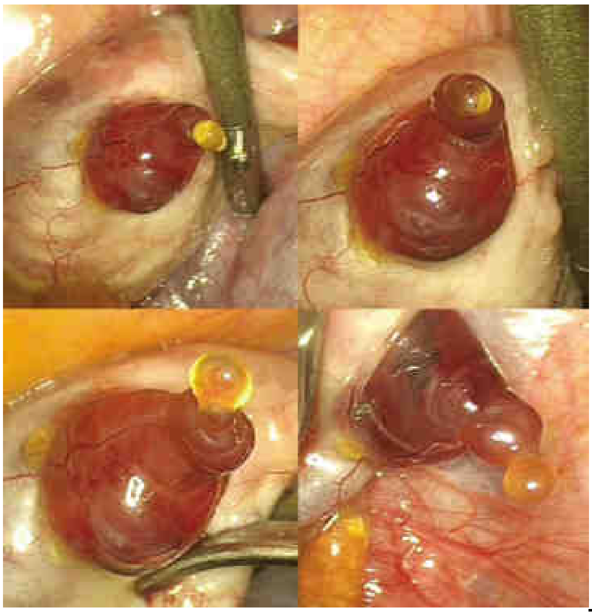 (https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/ov-4.jpg)

ডিম্বানু বলতে জীবের স্ত্রীজনন কোষ বুঝানো হয় যা জীবের যৌন জনন প্রক্রিয়ায় শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হয়ে থাকে। ডিম্বাণু সাধারনত হ্যপ্লয়েড ক্রোমোসোম ধারন করে থাকে। নিষিক্ত ডিম্বাণু ডিপ্লয়েড যা প্রথমে জাইগোট গঠন করে যা পরবর্তিতে ভ্রূন এবং শিশু জীবে পরিনত হয়।
ডিম্বানু থাকে ডিম্বাশয়ে। একটা মেয়ের ডিম্বাশয়ে মিলিয়ন সংখ্যক অপরিণত ডিম্বানু থাকতে পারে । ডিম্বস্ফোটনের সময় পরিণত ডিম্বানু ফেলোফিয়ান নালিকা দিয়ে ক্রমশঃ নালিকার নিচের দিকে যেতে থাকে এবং অপেক্ষারত শুক্রানুর সাথে (যদি থাকে) মিলিত হয়ে নিষিক্ত হয়। ডিম্বস্ফোটনের সময় সম্ভাব্য গর্ভধারণ প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য জরায়ুর প্রাচীর পুরু হয়ে উঠে। সাধারণত একবার ডিম্বস্ফোটনের সময় একটা ডিম্বানুই নির্গত হয়। একটা ডিম্বানু ডিম্বাশয় ত্যগ করার পর সাধারণতঃ আর ১২-২৪ ঘন্টা বেঁচে থাকে।ডিম্বস্ফোটনের সময় অনেকে ডিম্বাশয়ের আশেপাশের এলাকায় মৃদু ব্যাথা অনুভব করতে পারে। একে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় mittelschmerz বলে। ডিম্বস্ফোটনের সাথে মাসিকের (Menses)কোন সম্পর্ক নেই। ডিম্বস্ফোটন না হলেও মাসিক হতে পারে আবার মাসিক ছাড়াও ডিম্বস্ফোটন ঘটতে পারে।অনিষিক্ত ডিম্বানু খন্ড বিখন্ড হয়ে পরে জরায়ুর প্রাচীর কর্তৃক শোষিত হয়ে যায়। একজন পূর্ণাঙ্গ রমণীর ডিম্বাশয় থেকে প্রতি মাসে একটি করে ডিম্বাণু নির্গত হয় এবং এই ডিম্বাণু পুরুষের শুক্রকিটের সাথে পরিস্ফুটন না হলে তা আবার নস্ট হয়ে চলে যায় (যাকে মাসিক প্রক্রিয়া বলে , ২৮ দিন গড়ে, স্ত্রী রোগ অধ্যায়ে বিস্থারিত) । একজন নারী পিউবারটিস সময় থেকে শুরু করে মেণপোজের সময় পর্যন্ত ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত তার জিবনে প্রায় দুই মিলিয়ন oocyte বা ডিম ডিম্বাশয়ে তৈরী করার যোজ্ঞতা রাখলেও মাসে মাত্র একটি ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় এবং স্ত্রী জীবনে ৪৫০ পর্যন্ত ডিম্বাণু পরিস্ফুটনের ক্ষমতা থাকে । শুধু এক ডিম্বাশয় থেকে একটি একক oocyte বা ডিম প্রতিটি মাসিক চক্র সময় মুক্তি হয় বা প্রতিটি ডিম্বাশয় একটি ডিম মুক্তির মধ্যে একটি বিকল্প মোড় নেয়.
একজন মহিলা পিউবারটি থেকে মেনপোজ পর্যন্ত ডিম্বাশয়ে প্রায় ৩-৪ লক্ষ প্রিমর্ডিয়াল ফলিকল (Primordial

folicle) থাকে এই ফলিকলগুলো হরমোনের প্রভাবে প্রতিমাসে বৃদ্ধি পায়। এদের ভিতরে একটি ফলিকল সবচেয়ে বড় আকার ধারণ করে। একে বলা হয় গ্রাফিয়ান ফলিকল (Graafian folicle)। প্রজননের ক্ষেত্রে এই গ্রাফিয়ান ফলিকেল (উর্বর ডিম্ব'।) ই সন্তান হিসাবে জন্ম নেয় সেই হিসাবে একজন মহিলা সারা জিবনে 400-500 ডিম পরিস্ফুটনের যোগ্যতা থাকে (অর্থাৎ ৪০০/ ৫০০ সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা থাকত যদি ……………………।। (রিসার্চ) !!!!! (অর্থাৎ একজন মহিলা চাইলে তার সার জীবনে ৪৫০ টি সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন যদি ডিম্ব পরিস্পুটনের মুহূর্তে স্থান্তর করে টিউব পদ্ধতি বেচে নেওয়া হয় ।) সেই হিসাবে প্রথম পুরুষ আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়ার যে প্রজনন ক্ষমতা বেশি ছিল (প্রচলিত ইতিহাস থেকে শুনা যায়) তা ১০০% সত্য বলে প্রমাণিত । আধুনিক বিজ্ঞান তাই বলে দেয় – অর্থাৎ একজন মহিলা যদি ৪৫ বছরের ভিতরে ৪৫০ সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তা হলে বিবি হাওয়া বা তার পরবর্তী জেনারেশনরা কি পরিমাণ সন্তান জন্ম দিয়েছেন মহিলাদের ডিম্বকোষ এবং পুরুষদের শুক্রকোষের জীবন বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে , আমার মনে হয় কাউকেই আর বুজিয়ে বলা লাগবেনা ।

অভুলেশন / ডিম্ব পরিস্পুটন প্রক্রিয়া বা গর্ভ কিভাবে হয় ঃ-

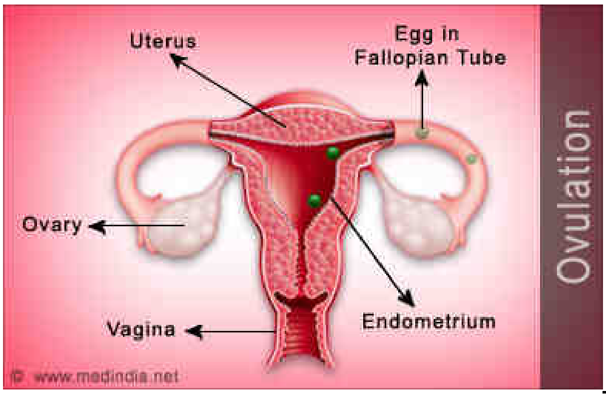

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/ov-5.jpg)
যখন যৌন মিলন বা যে কোন উপায়ে শুক্রানু নারীর যোনিমুখ দিয়ে অথবা বাহির থেকে টিউবের মাধ্যমে জরায়ুতে প্রবেশ করানো হয় (কম পক্ষে ১ মিঃলিঃ এবং এতে ৩ মিলিয়ন শুক্রাণু থাকতে পারে) তখন কিছু কিছু শুক্রানু জরায়ুর মুখ থেকে সাঁতরে জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মেয়েদের তখন ডিম্বাণুর নি:সরণ হয় । সে সময় জরায়ুর উপযোক্ত পরিবেশের কারণে জরায়ুর ভিতরের শ্লেষ্মা অন্যান্য সময়ের চেয়ে পাতলা হয়, ফলে শুক্রানু অনায়াসেই এর মধ্য দিয়ে যেতে পারে। শুক্রানু গর্ভাশয়ের মধ্য দিয়ে সাঁতরে ডিম্বনালী (ফেলোপিয়ান টিউব) এ প্রবেশ করে। এখানেই ডিম্বাশয় থেকে নির্গত ডিম্বানু অবস্থান করে। এই শুক্রানু ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলে গিয়ে নিষিক্ত হয়, অর্থাৎ গর্ভাবস্থার সূচনা হয়। আর এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় ডিম্বনালীতে (শুক্রাণু ও স্ত্রীর ডিম্বাণু ডিম্বনালির প্রায় শেষ প্রান্তে, অম্বুলা নামক জায়গায় মিলিত হলে নিষেক সংঘটিত হয়। নিষেকের ফলে যেটি তৈরি হয় সেটিকে ভ্রূণ বলে) এভাবে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু নি:সৃত হওয়ার পাঁচ থেকে সাতদিন পর নিষিক্ত ডিম্বাণুটি গর্ভাশয়ের দেয়ালে নিজেকে প্রতিস্থাপন করে এবং শেকড়ের মতন কিছু 'ভিলাই' তৈরি করে।আর এই 'ভিলাই'গুলিই পরবর্তীতে বেড়ে উঠে গর্ভফুল বা প্লাসেন্টা (প্লাসেন্টা, এমন একটি অঙ্গ যা, জন্ম নেয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত শিশুকে খাওয়ানো এবং রক্ষায় সাহায্য করে) তৈরি করে। ২৮০ দিন থাকার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় (+-৭ দিন) । এ সময়ের মধ্যে ডিম্বাশয়ে আর ডিম্ব প্রস্ত্তত হয় না। ফলে ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে এবং সন্তান সৃষ্টির কাজ প্রকৃতির অপূর্ব ভাবে চলতে থাকে।
আরেকটু স্পষ্ট করে যদি বলি ঃ- (বৈজ্ঞানিক ভাবে) মানুষের মোট ক্রোমোজোমের সংখ্যা ৪৬ (46) জোড়া, এর মধ্যে পিতার শরীর থেকে শুক্রাণুর মাধ্যমে আসে ২৩ জোড়া ও বাকী ২৩ জোড়া আসে মায়ের শরীর থেকে ডিম্বাণুর মাধ্যমে। মায়ের শরীরে এই শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে যাকে বলা হয় নিষেক বা ফার্টিলাইজেশন। নিষেকের ফলেই সৃষ্টি হয় পুরো ৪৬ জোড়া ক্রোমোজোমবিশিষ্ট নতুন ভ্রূণের, যা প্রায় নয় মাস ধরে মায়ের শরীরে জরায়ুর মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে পরিশেষে নতুন শিশু হিসেবে ভূমিস্থ হয়।
ডিম্ব পরিস্পুটন বা নিষিক্ত কখন হয় ঃ– (প্রাকৃতিক উপায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির একটা অংশ)

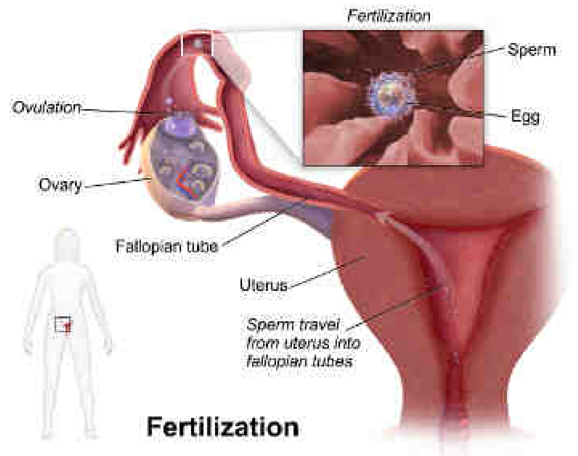

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/ov-6.png)

মাসিক ঋতুচক্রের মাঝামাঝি (অর্থাৎ ১৪ দিনের মাথায়) লুটিনাইজিং হরমোন (LH) ক্ষরণের ৩৬-৩৮ ঘন্টার মধ্যে ডিম্বকোষ (Ovum) নির্গত হয়। তখন ডিম্বকোষ যদি ৩৬ ঘন্টার মধ্যে উপযুক্ত সংখ্যক শুক্রকোষ পায় তখন গর্ভ সঞ্চার হয় । এর পর ও ডিম্বকোষটি জীবিত থাকে আরো প্রায় ৩৬ ঘন্টা অর্থাৎ ডিম্বকোষের আয়ু সর্বমোট ৭২ ঘন্টা বা তিনদিন। অন্যদিকে যৌনমিলনের পর জরায়ু তথা ডিম্বনালীতে প্রবেশের পর শুক্রকোষও (spermatorza) জীবিত থাকতে পারে সর্বাধিক ৭২ ঘন্টা । তাই ২৮ দিনের মাসিক ঋতুচক্রের মাঝামাঝি মোট প্রায় ১২০ ঘন্টা (৫দিন) হচ্ছে উর্বর সময়,–এই সময় যৌনমিলন হলে সন্তানের জন্ম হতে পারে। মোটামুটি মাসিকের ১৪ দিনের মাথায় ডিম্বকোষ হচ্ছে ধরে নিয়ে তার ২-৩ দিন আগে ও ২-৩ দিন পরে হচ্ছে এই উর্বর সময়। সাধারণভাবে ১১ তম -২০শ দিনের মধ্যকার সময়টিকে উর্বর সময় হিসাবে ধরা যায় (বেশির ভাগ ১৪ম থেকে ১৭ম এই পাঁচ দিন ৭১% সম্বাভনা ডিম্ব নিষিক্ত হওয়ার সময়)- কখন ও এর কিছুটা ব্যাত্রিক্রম ঘটে বিধায় এর আগে পিছে দুই দিন যোগ করে নিলে মহিলাদের গর্ভ সঞ্চার হওয়ার সম্বাভনা ৯৬% মুক্ত থাকে বলে মনে করা হয় (১৩ম – ২১ তম= ৯ দিন) । (বিস্তারিত স্ত্রী রোগ অধ্যায়ে জেনে নিবেন)

হিজরা সন্তান কিভাবে হয় ঃ

এক্স এক্স প্যাটার্ন ডিম্বানুর সমন্বয়ে কন্যা শিশু আর এক্স ওয়াই প্যাটার্ন থেকে সৃষ্ট হয় ছেলে শিশু। ভ্রূনের পূর্ণতার স্তর গুলোতে ক্রোমোজোম প্যাটার্নের প্রভাবে ছেলে শিশুর মধ্যে অন্ডকোষ আর কন্যা শিশুর মধ্য ডিম্ব কোষ জন্ম নেয়। অন্ডকোষ থেকে নিসৃত হয় পুরুষ হরমোন এন্ড্রোজেন এবং ডিম্ব কোষ থেকে নিসৃত হয় এস্ট্রোজেন। ভ্রূনের বিকাশকালে নিষিক্তকরন ও বিভাজনের ফলে বেশকিছু অস্বাভাবিক প্যাটার্নের সৃষ্টি হয় যেমন এক্স এক্স ওয়াই অথবা এক্স ওয়াই ওয়াই। এর ফলে বিভিন্ন গঠনের হিজড়া শিশুর জন্ম হয়। (মনে রাখবেন হিজড়া শিশুকে যদি পরিনত বয়সে যাওয়ার আগে যথাযথ মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করা হয় তাহলে বেশীভাগ ক্ষেত্রেই তাকে সুস্থ করা সম্ভব।)

যমজ সন্তান কিভাবে হয় ?
অনেক মা ই প্রসবের সময় এক সাথে দুই বা কখনো তার অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন। এ নিয়ে অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে কিভাবে ? । ইহা প্রকৃতিক এবং বেশ রহস্য জনক (বিষয় টি একটু জটিল বিধায় পরবর্তীতে জানতে পারবেন) তবে জমজ সন্তান দুই ভাবে হয়ে থাকে –
বাইনোভুলার বা ডাইজাইগোটিক (Binovular/ Dizygotic)ঃ- মায়ের জরায়ুতে শিশু দুটি সম্পূর্ণ আলাদা দুটি ডিম্বানু থেকে জন্ম নেয় এবং নিষিক্ত করা শুক্রানু দুটিও সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে মিলিত হওয়ার কারণে দুটি শিশুর ভ্রূন আলাদা ভাবে তৈরি হয় একি জরায়ুর ভিতর । ফলে শিশু দুটির আলাদা আলাদা দুটি প্লাসেন্টা থাকবে এবং এদের লিঙ্গ (sex) ও ভিন্ন হতে পারে । এ ধরণের দুটি শিশুর একসাথে লেগে থাকার সম্ভাবনা একেবারে কম যা গর্ভ বতি মায়েদের যমজ সন্তান প্রসবের ৮০% ই এ রকম হয়ে থাকে । অন্যান্য বৈশিষ্টের মধ্যে এ ধরণের জন্ম নেওয়া সন্তান্দের দেহের গঠন, রক্তের নমুনা, বা অন্যান্য আচরণ এক হয়না বা দুজনের দেহের গঠন ও এক না হতে পারে ।
ইউনিওভুলার বা মনোজাইগোটিক (Uniovular/ Monozygotic) ঃ- এ ক্ষেত্রে মায়ের একটি ডিম্বানু তে নিষিক্ত হয়ে যদি দুটি শিশুর জন্ম হয় ও পরবর্তীতে নিষিক্ত ডিম্বানুটি পরবর্তীতে বিভাজিত হয়ে দুটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়। । অর্থাৎ শিশুর দুটির একই প্লাসেন্টা থাকে। এ ধরণের যমজ সন্তান্দের বেলায় দুটির লিঙ্গ এবং সকল শারীরিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট প্রায় এক রকম থাকে। কারন শিশু দুটি একই জীন (Gene) বহন করে এবং সকল বৈশিষ্ট একই রকম হয় তাই এদের কে অনেক সময় আইডেন্টিকাল টুইন (Identical twin) বলা হয় । তবে অনেক সময় এই সব ক্ষেত্রে ৬০% বেলায় একটি শিশু অন্য শিশুর সাথে জোড়া লেগে থাকতে দেখা যায় সে জন্য মায়েদের একটু ঝুকি বেশি থাকা স্বাভাবিক , তার পর ও অভিজ্ঞ সার্জনের মাধ্যমে একটি শিশুর পূর্ণ জীবন ধারন ক্ষমতা রাখে । বা আধুনিক পদ্ধতিতে

আর ও অনেক কিছু করা সম্ভভ । তবে সাবধান এ ধরণের মায়েদের কে সব সময় বাড়তি সতর্কতার সহিত যত্ন করে রাখবেন কেন না তিনিদের বেশির ভাগ মহিলা এনিমিয়া, এক্লাম্পসিয়া, এন্টিপারটাম হেমোরেজ, ম্যাল প্রেজেন্টেশন, প্রিটার্ম লেবার সহ নানাবিধ সমস্যা হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী থাকে।

টেস্টিউব পদ্ধতি ঃ-

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/ov-7.jpg)

টেস্টটিউব পদ্ধতিতে বর্তমানে দুই ধরণের । একটি আইভিএফ (IVF) এবং ইকসি (ICSI) ।
আইভিএফ পদ্ধতি ঃ স্বামী-স্ত্রীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে বিশেষ জাইগেশন জিন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি গ্লাসের যারে বা পাত্রে একত্রীত করে নিষিক্ত করার ব্যবস্থা করা হয় তখন উক্ত পাত্রে একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য লাখের মত শুক্রাণু চাড়া হয় (আধা মিঃলিঃ) তখন শুক্রারুনুর নিজের ইছছায় যে কোন একটা কীট ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশ করেই তাকে নিষিক্ত করে (ভ্রূণ) তখন যে সব পুরুষের বীর্যে শুক্রাণুর পরিমাণ কম থাকে তাদের বেলায় প্রয়োজনে অণ্ডকোষ থেকে আলাদা ভাবে অস্ত্রপাচারের মাধ্যমে বিশেষ পরিক্ষার মাধ্যমে বাচাই করে সুস্থ ও মানসম্পন্ন কীট টি কে মাইক্রোজ্যানেটিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি শুক্রকিটকে ইঞ্জেকট করে ডিম্বাণুর ভিতর ঢোকিয়ে দেওয়া হয় এবং তা একটি ইনকিউবেটরে রেখে সেখানে ভ্রূণের সৃষ্টি করা হয় যা করতে সময় লাগে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা । এইসব পদ্ধতিতে ইচ্ছা মত ডিম্বাণুর মাধ্যমে নতুন ভ্রুন তৈরি করা সম্ভব বা এ থেকে পরিক্ষা করে ভাল ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভ্রূণ টিকে মহিলাদের জরায়ুতে স্থানন্তর করা হয়ে থাকে । পরবর্তীতে মায়ের জরায়ুর ভিতর স্বাভাবিক গর্ভসঞ্চালনের মতো ভ্রুন টি বৃদ্ধি পেয়ে সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ শিশু জন্মাতে থাকে । এর আরেক নাম ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন।
এখানে শুধু মাত্র ডিম্বাশয় বা ডিম্বাণুর কাজ বাহিরে কৃত্রিম ভাবে শুক্রাণুর দ্বারা করে যথা উযোক্ত ভাবে মহিলার জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয় । এরপর স্বাভাবিক ভাবেই শিশু মাতৃগর্ভে বেড়ে ওঠে – মুলত ইহাই টেস্টিউব পদ্ধতি । আমার জানা মতে যদি স্বামী শ্রীর দুজনের ডিম্ব ও শুক্রাণুর দ্বারা তা করানো হয় (শ্রীর ডিম্বাণুর বা অভারির কোন সমস্যা থাকলে) তা হলে সামাজিক বা ধর্মীয় তেমন বিধি নিষেধ আসার কথা নয় (তার পর ও ভাল ধর্ম বিশেষজ্ঞের পরামশ নেওয়া ভাল) কেন না ইউরোপ অ্যামেরিকায় এসব তেমন দেখা হয়না বরং জেনেট্যিকেল জিনের শিশুটি উচ্চ ডিএন এ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার জন্য অনেক মহিলা টাকা বা সম্পর্কের বিনিময়ে অনেক সুপুরুষের শুক্রাণু দিয়ে নিজ পেটে সন্তান ধারন করে থাকেন (সে জন্য ডিম্ব বা শুক্রকিটের আলাদা ব্যাংক ও রয়েছে সেখানে হিমায়িত করে রাখার ব্যাবস্থা ও আছে) যা এশিয়ান সমাজ ও ধর্মীয় ভাবে কখন ও তা গ্রহন যোগ্য নয় । (আর ও জানতে হলে জ্যানেটিক্যাল অধ্যায়ে দেখুন)

কিভাবে একজন পুরুষের পেট হতে সন্তান জন্ম হতে পারে? :

না কখন ও একজন পুরুষ একটি সন্তান মহিলাদের মত জন্ম দিতে পারবেনা (এক্স- ওয়াই , ক্রোমোসোমস ছাড়া, অসম্ভব) – এখন পর্যন্ত আই ভি এফ পদ্ধতিতে ((IVF techniques) – শুধু পারা যাবে অভুলেশন প্রক্রিয়ায় নিষিক্ত ডিম্বাণু কে পেটের ভিতর পেরিটেনিয়াম এবং ডুয়েডেনামের মধ্য বর্তি স্থানে পরিস্ফুটিত ডিন্মবকে রেখে ভুমিস্ট করা যা মহিলাদের জরায়ুর বিকল্প ব্যাবস্থা মনে করা হয় – অর্থাৎ এর জন্য জীন ট্যাকনোলিজিস্ট রা প্রথমে পেটের বাহিরে শ্রীর ডিম্বাণু ও পুরুষের শুক্রকিটকে নিষিক্ত করে তা পেটের ভিতর পেরিটিনিয়াম এর নিছে যে কোন একটি অংশে চিপমেন্ট করে রেখে দেন (an embryo and placenta into the abdominal cavity, just under or into the peritoneum- the surrounding lining) । পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত নিষিক্ত ডিম্বাণু (প্লেসেন্টা) বা গর্ভ ফুল ধিরে ধিরে সেখানে বড় হতে থাকে । সে জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যা যা করে থাকেন –

যেমন বাহির থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ফেমেইল হরমোন প্রয়োগ এবং নির্দিষ্ট অতিরিক্ত কিছু তত্তবাধনে রাখতে হয় । সেই সাথে প্লেসেন্টার সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথেই অস্রপাচারের মাধ্যমে তাকে ভুমিস্ট করতে হয় । তবে বাচ্চা ভুমিস্ট হওয়ার পর এই পুরুষের স্থনে মায়েদের মত দুধ দেওয়া বা আনুসাঙ্গিক অন্যান্য কোন কিছুই করা সম্বভ নয়, যদিও হরমোন রিসার্চ অনুসারে পুরুষের স্থনে দুধ দেওয়ানো সম্বভ, কিন্তু পুরুষের পুরুষত্ব থাকেনা বিদায় তা কখন ও অনুমতি দেওয়া হবেনা । যেমন গত বছর ইউকে তে ও এর বৈধতা দেওয়া হয়েছে – (Thomas Trace Beatie ২০০২ সালে – তার পেটে সন্তান দেওয়া হয়েছিল – তিনির স্রী জরায়ুর উর্বরতার কারণে বন্ধ্যাত্ত বরণ করেন, সে জন্য তার স্রীর ডিমাবানু নিষিক্ত করে থমাসের পেটে ধারন করার জন্য দেওয়া হয়) – তবে আধুনিক প্রযোক্তির কারণে পুরুষের পেটে সেই সন্তান কে না রেখে ও বায়োটিউবের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়া সম্বভ এবং এর জন্য কোন পুরুষ বা মহিলা কারও গর্ভে সন্তান কে ধারন করতে হবেনা (এই পদ্ধতি সব সময় খুভি ব্যায়বহুল থাকবে) । তারপর ও গবেষণা গারে জেনেট্যিকেল ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীরা নিষিক্ত ডিম্বাণুকে শক্ত সেলুলার তৈরি করার জন্য আপ্রান চেস্টা করিতেছেন, বা পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানীরা অন্যান্য প্রানির ডিমের মত মানুষের ডিম্বাণু ও আদ্র পরিবেষে যে কেউ রাখতে পারবেন বলে মনে করা হইতেছে (সাইন্স ট্যাক)
ফ্যালোপিয়ান নালি বা fallopian tube ঃ ফ্যালোপিয়ান নালি মূলত সিলিয়া বিশিষ্ট ভাজক টিশ্যু দ্বারা গঠিত দুটি নালি, যা স্তন্যপায়ী প্রাণীতে ডিম্বাশয় থেকে শুরু হয়ে ইউটেরো-টিউবাল জাংশন হয়ে জরায়ুতে গিয়ে শেষ হয়েছে ।

জরায়ু ঃ

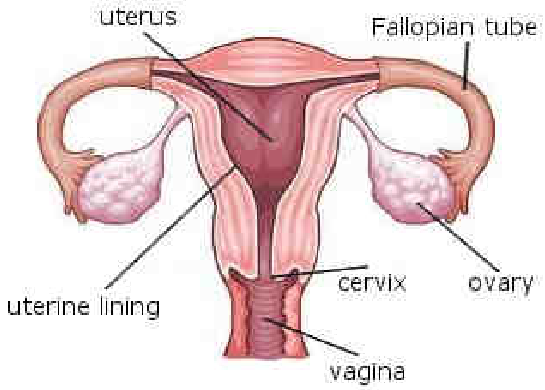

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/ov-8.png)

– জরায়ু (womb ঊম্, ইউটেরাস্ বা গর্ভ থলি) স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ। জরায়ু একটি হরমোন প্রতিক্রিয়াশীল অঙ্গ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হরমোন ক্ষরণের দ্বারা এর কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হয়। গর্ভধারণ কালে ফিটাস জরায়ুর অভ্যন্তরে বড়ো ও বিকশিত হয়। গর্ভধারণের সময় ছাড়া মহিলাদের জরায়ু আকারে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিস্ট থাকে । জরায়ু একটি পেশিবহুল অঙ্গ। এর আকৃতি অনেকটা নাশপাতির মতো। জরায়ুকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। যথা: ফান্ডাস (জরায়ু), কর্পাস, সারভিক্স, এবং অন্তঃস্থ অরফিস। পুরুষের শুক্র কীট যোনি পথ ধরে জরায়ুতে প্রবেশ করে, এরপর ডিম্বনালীতে অবস্থিত ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়। শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে ভ্রূণের শেষ স্থরে পৌঁছে । এরপর নিষিক্ত ডিম্বাণু জরায়ুতে প্রবেশ করে। এই অবস্থাকে নারীর গর্ভ-সঞ্চার কাল ধরা হয়। জরায়ুতে ভ্রূণটি পৌঁছার ৪/৫ দিনের মধ্যে, জরায়ুর অন্তঃপ্রাচীরের গায়ে যুক্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ভ্রূণ ও জরায়ুগাত্রের মধ্যে কিছু কোষ যুক্ত হয়ে ভ্রূণকে স্থিতি অবস্থায় রাখে। এই সংযুক্ত কোষরাশিকে অমরা গর্ভফুল বা প্লেসেন্টা বলে থাকি । এই গর্ভফূলের দ্বারা ভ্রূণ মাতৃদেহ থেকে খাদ্য পায় এবং ভ্রূণের দেহ থেকে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বেরিয়ে যায়। জরায়ুতে ভ্রূণটি বড় হতে থাকে। ভ্রূণের ক্রমাগত বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জরায়ু বৃদ্ধি পায়। ভ্রূণ থেকে মানব শিশুতে পরিণত হতে প্রায় ২৮০ দিন সময় লাগে। (-+ ৭ দিন) । আর গর্ভফুল মায়ের জঠরে থাক্র সব কিছু সহ মায়ের রক্ত থেকে অক্সিজেন, অ্যামিনো এসিড, ভিটামিন এবং মিনারেল গ্রহণে সহায়তা করে। এটি শিশুর দেহ থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করে শিশুকে সুস্থ রাখে।
অন্য দিকে যদি যৌন মিলন না হয় তখন মহিলাদের অভারি থেকে ডিম্ব পরিস্পুটিত না হয়ে জরায়ুর মধ্যে স্রিত অবস্থায় চলে আসে এবং সেখানে প্রজেসটেরোন’ নামে এক প্রকার হরমোন নিঃসৃত হয়ে জরায়ুর বৃদ্ধি ও নিয়মিত মাসিকের সূত্রপাত ঘটায়। জরায়ুর ভেতরের গায়ে শ্লেষ্মা ঝিল্লির আবরণে ‘ইসট্রোজেন’ ও ‘প্রজেসটেরোনের’ সম্মিলিত ক্রিয়া শুরু হয়। সেই ঝিল্লির বিবর্তনের ফল ঋতুস্রাব। ইসট্রোজেন ও প্রজেসটেরোনের প্রভাবেই ২৮ দিন অন্তর চক্রাকারে পরিবর্তনের ফলে হয় নিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব হয়ে থাকে বা এর বাড়তি কমতির কারণে মহিলাদের ভিন্ন রকম মাসিক জনিত সমস্যা বা স্রী রোগ জাতীয় অসুখ দেখা দেয় ।

২. সারভিক্স (Cervix)

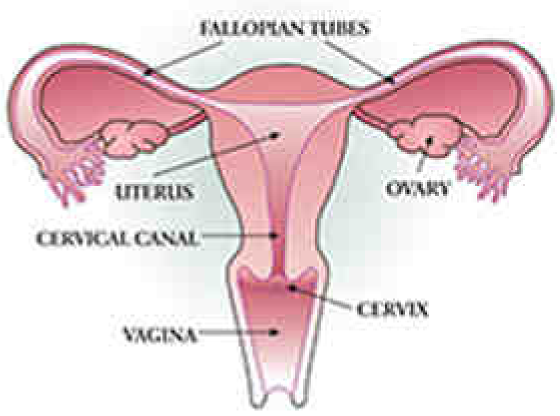

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/ov-9.jpg)

– সারভিক্স হল জরায়ুর নিচের অংশ যা যোনির উর্ধ্বাংশের সাথে যুক্ত থাকে। সারভিক্স বেলনাকার বা চোঙের মতন দেখতে হয়। সারভিক্সের উপবৃত্তাকার যে অংশ যোনির মধ্যে ঢুকে থাকে তাকে বলা হয় এক্টোসারভিক্স। এই অংশের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ সেমি. ও প্রস্থ প্রায় ২.৫ সেমি.। এক্টোসারভিক্সের একেবারে সম্মুখে অবস্থিত ছিদ্রকে সারভিক্সের বহিঃরন্ধ্র বলা হয় এবং জরায়ু থেকে শুরু করে বহিঃরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সারভিক্সের ভেতরের ফাঁকা নলের মত অংশকে বলা হয় সারভিকাল ক্যানাল। ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে এই ক্যানালের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ব্যাপক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যেসকল নারী স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে শিশুর জন্ম না দেন তাদের ক্ষেত্রে সারভিক্সের বহিঃরন্ধ্র খুব ক্ষুদ্র হয়, কিন্তু যারা স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে শিশুর জন্ম দিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে এই ছিদ্রের আকার অনেকটাই বড়। স্বাভাবিক প্রসবের সময় জরায়ুর সংকোচনের ফলে সারভিকাল ক্যানালের ব্যাস বৃদ্ধি পেয়ে ১০ সেমি. পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে রজঃস্রাবের সময় সারভিক্সের বহিঃরন্ধ্র ও ক্যানাল একটু বেশি ফাঁকা হয়ে যায় রজঃস্রাবে সহায়তার জন্য। সারভিক্সের এই প্রসারণই ঋতুস্রাবের সময় অনেক মহিলার তলপেটে ব্যাথার অনুভব করেন । প্রথমবার স্বাভাবিক প্রসবের পর ঋতুস্রাবের সময় এই ব্যাথা সাধারণত আর হয় না, কারণ প্রসবের ফলে সারভিক্সের মুখ অনেকটাই স্থায়ীভাবে প্রসারিত হয়ে যায় সে জন্য নর্মাল সন্তান প্রসব একটি ভাল দিক
শ্রীর যৌনাঙ্গ বা এর কাজ কি বা কেন এত অনুভুতিশিল ? ঃ- (এ নিয়ে এত বেশি আশ্চর্য হওয়ার কিছু নয় বরং গর্ভজাত সন্তান কিভাবে গড়ে উঠে বা জীবন ধারন করে, সেটাই আশ্চর্যের বিষয়)

বাহ্যিক যৌনাঙ্গঃ

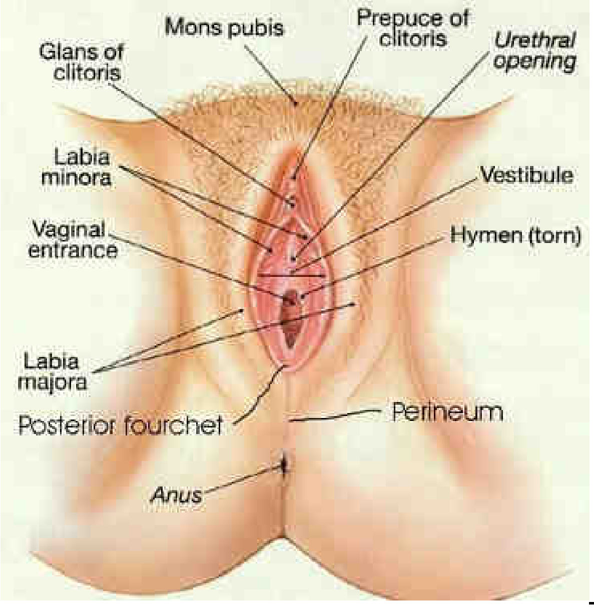

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/ov-10.jpg)

(১) যোনিমুখ বা যোনিদ্বার (Vulva): স্ত্রী জননাঙ্গের সবথেকে বাইরের অংশ এটি। সাধারণ পরিভাষায় অধিকাংশ

সময়ই এই অংশকে যোনি বা vagina বলে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে যোনি হল স্ত্রী জননাঙ্গের একটি ভেতরের অংশ। এটি একটি ৩ ইঞ্চি (৮ সে.মি.) লম্বা চোঙ জাতীয়। এটি জরায়ুমুখ থেকে ভুল্বা (যোনিদ্বার) পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে এটি দু'পায়ের ফাঁকে উন্মুক্ত হয়। এটি স্থিতিস্থাপক তাই সহজেই শিশ্ন অথবা শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা করে দিতে পারে। ভুলবা বা যোনিদ্বার গঠিত হয় বৃহদোষ্ঠ (labia majora), ক্ষুদ্রোষ্ঠ (labia minora), মন্স পিউবিস (mons pubis), ভগাঙ্কুর (clitoris), ভালভার ভেস্টিবিউল, মূত্রছিদ্র (external urethral orifice), যোনি রন্ধ্র (vaginal orifice) ইত্যাদি দিয়ে।
মন্স পিউবিস বা মন্স ভেনেরিস (mons pubis): ভালভা বা যোনিদ্বারের অগ্রভাগে পিউবিক হাড়ের উপর অবস্থিত ফ্যাটি টিস্যু সম্মৃদ্ধ নরম ঢিপির মত জায়গাটিকে বলা হয় মন্স পিউবিস বা মন্স ভেনেরিস। এটি যৌনসঙ্গমের সময় আঘাত থেকে পিউবিক হাড়কে রক্ষা করে। মন্স পিউবিস সাধারণত বয়ঃসন্ধির পর থেকে পিউবিক চুল বা যৌনকেশ দ্বারা আবৃত থাকে। এই যৌনকেশের পরিমান অনেক ক্ষেত্রেই বংশগতির উপর নির্ভর করে। মন্স পিউবিস আরও নিচে নেমে দুটি বৃহদোষ্ঠে ভাগ হয়ে যায়। ইস্ট্রোজেন নামের হরমোনের প্রভাবে বয়ঃসন্ধির পর থেকেই সাধারণত এই মন্স পিউবিস বাইরের দিকে ফুলে ওঠে।
বৃহদোষ্ঠ (Labia Majora): নাম থেকেই স্পষ্ট যে এটা ভালভা বা যোনিদ্বারের সব থেকে বাইরের মোরক বা "ওষ্ঠ" (lips)। ভালভার অগ্রভাগে মন্স পিউবিস থেকে শুরু করে ভালভার পশ্চাৎভাগে পেরিনিয়াম পর্যন্ত ফ্যাটি টিস্যু ও মসৃণ পেশি সমন্বিত স্ফীত ও নরম এই বৃহদোষ্ঠ দুভাগে ভাগ হয়ে যোনিদ্বার বা ভালাভার প্রায় বাকি সমস্ত অংশকে ঢেকে রাখে। বৃহদোষ্ঠের দুভাগের মাঝখানের চিড়কে বলা হয় pudendal চিড় বা খাজ। মন্স পিউবিসের মত সাধারণত বয়ঃসন্ধির পর থেকে বৃহদোষ্ঠও যৌনকেশ বা পিউবিক চুল দিয়ে ঢাকা থাকে, তবে যৌনকেশের পরিমানে তারতম্য থাকতে পারে। বৃহদোষ্ঠের বাইরের ত্বকের রঙ শরীরের বাকি অংশের মত বা তার থেকে একটু বেশি ঘন হতে পারে। বৃহদোষ্ঠে প্রচুর স্বেদ ও তৈল গ্রন্থি থাকে যাদের থেকে ঘাম ও তেল ক্ষরিত হয়। অনেক গবেষকের প্রস্তাব যে এই তেল ও ঘামের গন্ধ যৌনউদ্দিপনামূলক। বৃহদোষ্ঠ স্পর্শ ও চাপের প্রতি বেশ সংবেদনশীল, যা যৌন সঙ্গমের সময় আনন্দের একটি উৎস।
ক্ষুদ্রোষ্ঠ (Labia Minora): বৃহদোষ্ঠের মধ্যবর্তি খাঁজে পাতলা টিস্যু সমণ্বিত দুটি ক্ষুদ্রোষ্ঠ বা labia minora থাকে। এই ক্ষুদ্রোষ্ঠ সাধারণত ভাজ হয়ে তার মধ্যবর্তি স্থানে অবস্থিত মূত্রছিদ্র, যোনিরন্ধ্র এবং ভগাঙ্কুরকে আগলে রাখে। ব্যাক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে ক্ষুদ্রোষ্ঠের আকারের তারতম্য হতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে এটা ছোট এবং বৃহদোষ্ঠের দ্বারা পুরো আবৃত থাকে, আবার অনেকের ক্ষেত্রের এর আকার অনেকটাই বড় যা বাইরে থেকেও দেখা যায়। এতে কোন কেশ থাকেনা কিন্তু সিবেসিয়াস গ্রন্থি থাকে যারা তেল জাতিয় পদার্থ ক্ষরণ করে। ক্ষুদ্রোষ্ঠ দুটি উপরের দিকে উঠে পরষ্পরের সাথে মিলিত হয়ে ভগাঙ্কুরকে ঢেকে রাখে। বৃহদোষ্ঠের মত ক্ষুদ্রোষ্ঠও স্পর্শ ও চাপের প্রতি বেশ সংবেদনশীল।
ভগাঙ্কুর (Clitoris): ভুলভা বা যোনিদ্বারেরে উপরের দিকে যেখানে ক্ষুদ্রোষ্ঠদ্বয় পরষ্পরের সাথে মিলিত হয় সেখানে ক্ষুদ্রোষ্ঠ দিয়ে ঢাকা অবস্থায় স্পঞ্জের মত টিস্যু দিয়ে তৈরি এটা একটা ছোট্টো, সাদাটে ও ডিম্বাকৃতি অঙ্গ যার একমাত্র কাজ যৌন আনন্দ প্রদান। বাইরে থেকে সাধারনত শুধু এর অগ্রভাগটাই দেখা যায়, কিন্তু আদপে এটা অনেকটা লম্বা। এটা ভেতরের দিকে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যোনিরন্ধ্রের দুপাশ দিয়ে নেমে ভালভার পশ্চাৎভাগে অবস্থিত পেরিনিয়ামের দিকে চলে গেছে। ভগাঙ্কুর অনেকটা পুরুষাঙ্গ বা পেনিসের মত এবং এর অগ্রভাগ একটি পাতলা চামড়া দিয়ে থাকে যাকে বলা হয় ভগাঙ্কুরের আবরক (clitoral hood)। যৌন উত্তেজনার সময় অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালনের ফলে ভগাঙ্কুর আকারে বৃদ্ধি পায় এবং এর উপরের আবরক ত্বক পেছনে চলে যায় যাতে এটা বাইরে থেকে সহজেই স্পর্শ করা যায়; এতে যৌন আনন্দ বেশি হয়। ভগাঙ্কুরের আকারও ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে। অনেকের ক্ষেত্রে এটা ছোট্ট, আবার অনেকের ক্ষেত্রে বেশ বড়, যা ওর উপরের আবরক ত্বক দ্বারা পুরো ঢাকা যায়না।
সতীচ্ছদ (Hymen):

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/ov-11.jpg)

এটা মিউকাস মেমব্রেন দিয়ে গঠিত একটা পাতলা পর্দা যা যোনিরন্ধ্রকে ঘিরে থাকে অথবা আংশিকভাবে ঢেকে রাখে। সাধারণত সতীচ্ছদ অর্ধচন্দ্রাকৃতির, তবে তার ব্যতিক্রমও যথেষ্ট হয়। সতীচ্ছদের মধ্যবর্তী ছিদ্রের আকার সবার ক্ষেত্রে সমান হয়না, কারও ক্ষেত্রে বড় আবার কারও কারও ক্ষুদ্র হতে পারে। এই ছিদ্রের মাধ্যমেই ঋতুস্রাবের রক্ত ও অন্যান্য পদার্থ বেরিয়ে আসে। সতীচ্ছদ বা hymen কে নিয়ে বহু কুসংস্কার ছড়িয়ে রয়েছে। সতীচ্ছদের অনুপস্থিতিকে কুমারীত্ব হারানোর লক্ষন হিসেবে গন্য করা হয়। সাধারণ ধারনা এই যে প্রথমবার যৌনসঙ্গমের সময় সতীচ্ছদ ফেটে রক্ত বের হবে; আর যদি তা না হয় তার মানে কন্যা কুমারী নয় (কিছু কিছু পুরাতন মহিলারা মনে করতেন) কিন্তু এই ধারনা ঠিক

নয়। প্রথমত যৌন সঙ্গমের ফলে সতীচ্ছদ নাও ছিড়তে পারে। যদি যৌনসঙ্গমের সময় সঠিকমাত্রায় লুব্রিকেশন (lubrication) হয় তবে সতীচ্ছদ ছিড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। দ্বিতীয়ত অনেকের সতীচ্ছদের মধ্যবর্তী ছিদ্র এমনিতেই বড় এবং সতীচ্ছদ এত স্থিতিস্থাপক হয় যে যৌনসঙ্গমের ফলে তার ফেটে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকেনা। তৃতীয়ত সাইকেল চালানো, নৃত্য অনুশীলন, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, হস্তমৈথুন, ট্যাম্পুন ব্যবহার ইত্যাদির ফলেও সতীচ্ছদ ফেটে যেতে পারে। সুতরাং সতীচ্ছদের উপস্থিত বা অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে কখওনই কারুর কূমারীত্ব নির্ণয় করা সম্ভব নয় অথবা এই ধরণের ধারনা সম্পূর্ণ ভুল ও কুসঙ্কস্কার ।
যোনিরন্ধ্র (Vaginal opening): এটি যোনির প্রবেশমুখ, যা সতীচ্ছদ দিয়ে ঘেরা বা আংশিক ঢাকা থাকে। এর মাধ্যমেই ঋতুস্রাবের সময় রক্ত এবং যৌনমিলনের সময় পুরুষাঙ্গ যোনির ভেতরে প্রবেশ করে। এছাড়াও স্বাভাবিক প্রসবের সময় এই রন্ধ্রের মাধ্যমেই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।
স্তন গ্রন্থি (Mammary gland) –

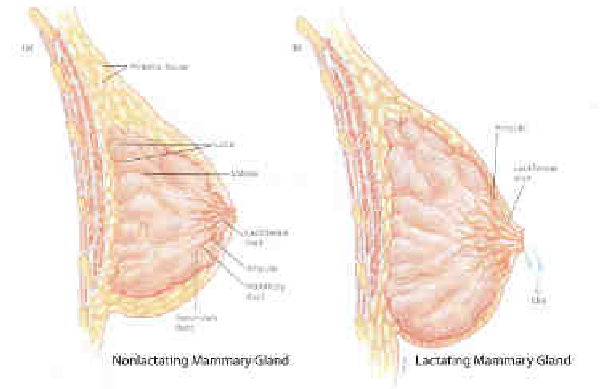

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/ov-12.png)

স্তনে অবস্থিত এই গ্রন্থি থেকে শিশুর পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। এটা বহিঃক্ষরা গ্রন্থি যা মূলত একধরনের পরিবর্তিত স্বেদ বা ঘর্ম গ্রন্থি। এই গ্রন্থির প্রধান অংশ হল অ্যালভিওলাই নামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর যাদের ভেতরের দেওয়ালে দুগ্ধ ক্ষরণকারী এপিথেলিয়াল কোষ থাকে। কিছু সংখ্যক করে অ্যালভিওলাই একত্রিত হয়ে এক একটি গুচ্ছের আকার ধারণ করে, যাদের বলা হয় লোবিউল। প্রতিটি লোবিউল আবার দুগ্ধউৎপাদক নালী বা laciferous duct এর মাধ্যমে স্তনবৃন্তের সাথে যুক্ত। অ্যালভিওলাইগুলিকে ঘিরে থাকে মায়োএপিথেলিয়াল কোষের আবরণ, যা পেশীর মত সংকুচিত বা প্রসারিত হতে সক্ষম। এই কোষগুলির সংকোচনের ফলেই অ্যালভিওলাই থেকে দুগ্ধ বেরিয়ে ল্যাসিফেরাস নালীর মাধ্যমে স্তনবৃন্ত পর্যন্ত পৌঁছায়। পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই স্তন গ্রন্থি বর্তমান, কিন্তু কেবল মহিলাদের ক্ষেত্রেই ডিম্বাশয় থেকে নিসৃত ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাবে বয়ঃসন্ধির পর থেকে এই গ্রন্থি বৃদ্ধি পায় এবং পরিণত হতে পারে। জন্মের সময় শিশুর কেবল ল্যাসিফেরাস নালীই বর্তমান থাকে। বয়ঃসন্ধির সময় ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে এই নালী থেকে অ্যালভিওলাইয়ের আদিকোষ তৈরি হতে শুরু করে। কেবল গর্ভাবস্থাতেই ক্রমবর্ধমান ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোনের প্রভাবে প্রকৃত

দুগ্ধক্ষরণকারী অ্যালভিওলাই গঠিত হয়। এর সাথে সাথে স্তনে চর্বিবিশিষ্ঠ অ্যাডিপোজ টিস্যু ও রক্ত সঞ্চালন, উভয়ই বৃদ্ধি পায়। গর্ভাবস্থার শেষের দিকে এবং প্রসবের প্রথম কয়েকদিন স্তন গ্রন্থি থেকে কলোস্ট্রাম নামের এক হলদে রঙের তরল ক্ষরিত হয় যা অ্যান্টিবডি সমৃদ্ধ হওয়ায় শিশুর রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। প্রকৃত দুগ্ধ ক্ষরণ শুরু হয় প্রসবের দিন কয়েক ঘন্টা পর থেকে যখন রক্তের প্রোজেস্টরন হরমোনের পরিমান কমে যায় এবং প্রোল্যাকটিন নামক হরমোনের আবির্ভাব হয়। স্থন গ্রন্থির বিভিন্ন কোষ খুব সহজেই উপযুক্ত হরমোনের প্রভাবে বৃদ্ধি পায় এবং বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ তৈরি করতে পারে। যদি এই কোষের এই বৃদ্ধি ও বিভাজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তবে তাকে ক্যান্সার বলা হয়। প্রায় সমস্ত রকমের স্তন ক্যান্সারের সূত্রপাত স্তন গ্রন্থির লোবিউল বা নালীগুলিতেই হয়।

এখন জেনে নিন যৌবনের সুচনা কিভাবে হয় বিজ্ঞান অনুসারে ঃ- (বয়ঃসন্ধি) Puberty

CATEGORIES স্বাস্থ্য ও জিবন

আর ও জানতে হলে আমার নতুন ওয়েবে ক্লিক করুন (ধন্যবাদ)

PUBLISHED ON *August 23, 2014August 23, 2014 by Health (স্বাস্থ্য) -3 Comments*

i
3 Votes

If you want moor please follow me (http://www.helalkamaly.com (http://www.helalkamaly.com))

CATEGORIES চিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যাবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও জিবন

হরমোন ৪থ পর্বের – (খ) পুরুষ জননতন্ত্রের গঠন এবং পুরুষ যৌন হরমোন নিয়ে কিছু কথা-

PUBLISHED ON *August 21, 2014 by Health (স্বাস্থ্য) -2 Comments*

i
3 Votes

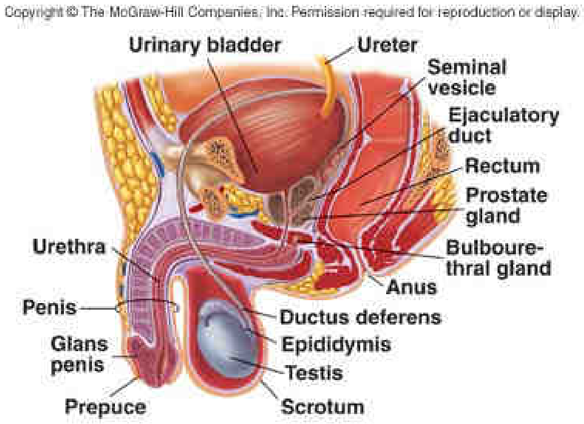

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/pen-2.jpg)

Reference from:- Dr Domingoঃ- University Hospitals Bristol NHS Trust / University of Manchester / Uni Rochester sex & Education – Alternatives to Human Growth Hormone HGH & sex hormone -Human Sexuality-Sexual Attitude Restructuring & Sexual Pleasure Education Research (Uni of BIU) And few of article from WHO & Bangladeshi Medical proffesors (Created Dr.Helal Kamaly)

(বিঃদ্রঃ হরমোন সমূহ নিয়ে বুজতে হলে মেডিক্যাল সাইন্সের এনাটমি এবং ফিজিওলজির সামান্য কিছু ধারনার দরকার তাই খুভি সামান্য ধারনা দেওয়ার চেস্টা করলাম বা শিক্ষণীয় অধ্যায়ের লেভেল ও এবং এ তে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ছেলেদের বেলায় ১৪ এবং মেয়েদের বেলায় ১২ বছরের নিছে যাহারা – তাদের জন্য এই পর্ব সমূহ উপযোক্ত নয় – Category X1 Approved WHO & DW Border এবং সামাজিক- ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি স্রধা ও মূল্যবোধ রেখেই প্রকাশিত – ডেইলি মেডিক্যাল সাইন্স ও মেন্স হেলথে ও প্রকাশিত হল)

(যৌন হরমোনের পুরুষদের বাকি অংশ)
পুরুষের আর ও কয়েক টি অঙ্গ আছে যা প্রজননতন্ত্র বা যৌন ক্রিড়াকলাপের সাথে জড়িত সে জন্য কিছুটা জেনে রাখলে ব্যাক্তি জিবনে অনেক সহায়তা হতে পারে (ভিডিও লাইভ চিত্র দেখার জন্য, লাইভ ভিডিও সমূহ ভিডিও প্রোগ্রামে দেখতে পারেন) ঃ-

বীর্য নালী (ejaculatory ducts)ঃ–

পুরুষের দুটি বীর্যস্খলন নালী থাকে যা প্রোস্টেট গ্রন্থির মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মূত্রনালীর সাথে যুক্ত হয়। বীর্যস্খলনের সময় বীর্য এই নালীর মাধ্যমেই মূত্রনালীতে এসে পৌছায়। কূপার্সের গ্রন্থি (Cowper’s gland) নামের বিশেষ একটি গ্রন্থি আছে যা প্রোস্টেট গ্রন্থির ঠিক নিচে অবস্থিত দুটি ছোট্ট বহিঃক্ষরা গ্রন্থিই হল কূপার্সের গ্রন্থি। যৌন উত্তেজনার সময় এই গ্রন্থি থেকে এক ধরনের স্বচ্ছ, নোনতা ও আঠালো তরল নির্গত হয় যা মূত্রনালীর মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই রস মূত্রনালীকে পরিষ্কার (অবশিষ্ট মূত্র ইত্যাদি থেকে) করে বীর্য নির্গমনের জন্য তৈরি করে। এছাড়াও এই রস মূত্রনালীর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে মূত্রনালী মসৃণ হয়ে যায় যা বীর্যকে বাইরে বের হতে সহায়তা করে। বলাই বাহুল্য যে যৌন উত্তেজনার সময় পুরুষের লিঙ্গের মাধ্যমে যে পিচ্ছিল রস বের হয় তা প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থির ক্ষরিত রস। এই রস যৌন মিলন বা হস্তমৈথুনের সময় লুব্রিকেশনের কাজও করে। এই রসে সাধারণত শুক্রাণু থাকেনা, কিন্তু অনেক সময় লিঙ্গের তলদেশে অবস্থিত মূত্রনালীর স্ফীত অংশে (eurethral bulb) আটকে থাকা পূর্ববর্তী বীর্যস্খলনের কিছু শুক্রাণু এই রসের সাথে বাইরে আসতে পারে।
এপিডিডাইমিস (Epididymis)–

যা শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালীকাগুলি পরষ্পরের সাথে যুক্ত হয়ে এপিডিডাইমিস নামক আরেকটি নালীকা গঠন করে, ইহা শুক্রাশয়ের পৃষ্ঠদেশে, পেছনের দিকে কুন্ডলী পাকিয়ে অবস্থান করে। এর মধ্যেই শুক্রাণু সম্পূর্ণরূপে পরিণত হয়। অতঃপর, এখানেই বীর্যস্খলনের পূর্ব পর্যন্ত শুক্রাণু জমে থাকে ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি লাভ করে। ভ্যাস ডিফারেন্স (Vax difference) – নামে আরেকটি নালী আছে যা এপিডিডাইমিসের শেষ প্রান্ত থেকে শুরু করে তলপেটের গহ্বরে অবস্থিত বীর্যস্খলন নালী (ejaculatory duct) পর্যন্ত বিস্তৃত শুক্রাণু বহনকারী নালীই হল ভ্যাস ডিফারেন্স। অরগ্যাসম বা যৌন আনন্দের চরম মুহূর্তে বীর্যস্খলনের সময় এই নালীদুটির গাত্রের মসৃণ পেশীর পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও শিথিলীভবনের ফলেই বীর্য নিঃসরণের সময় যৌনতা অনুবভ করে । এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ সে.মি. এবং ব্যাস প্রায় ৩ থেকে ৫ মি.মি. পর্যন্ত । সেখানে সেমিনাল ভেসিকল (Seminal Vesicles) নামের আরেকটি নালী আছে যা তলপেটের গহ্বরে মূত্রথলীর পেছনে দুপাশে অবস্থিত দুটি থলির মত গ্রন্থি । বীর্যের প্রায় ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ তরল এই গ্রন্থি

থেকেই ক্ষরিত হয়। এই গ্রন্থির ক্ষরিত রস সাধারণত ক্ষারধর্মী হওয়ায় তা শুক্রাণুকে যোনির মধ্যস্থ আম্লিক পরিবেষে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। এছাড়াও এই গ্রন্থির ক্ষরিত রসে প্রোটিন, ফ্রুকটোজ, ভিটামিন C, এনজাইম, মিউকাস, হরমোন ইত্যাদি থাকে। ফ্রুকটোজ শুক্রাণুর শক্তির উৎসরূপে কাজ করে।

লিঙ্গ বা শিশ্ন বা Penis –

এটি হল পুরুষের বাহ্যিক যৌনাঙ্গ যা যৌনসঙ্গমে অংশ নেয়। এছাড়া লিঙ্গ মূত্র ত্যাগের জন্যেও ব্যবহৃত হয়। একে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায় – মূলদেশ, লিঙ্গের দেহ এবং আবরক ত্বক। মূলদেশ লিঙ্গকে শরীরের সাথে জুড়ে রাখে। মানুষের লিঙ্গ প্রধানত তিনটি স্পঞ্জি টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত। এর মধ্যে দুটি লম্বাটে টিস্যু লিঙ্গের পৃষ্ঠদেশে পরষ্পরের সমান্তরালে অবস্থান করে (কর্পাস ক্যাভার্নোসাম)। অপরটি লিঙ্গের নিম্নদেশে ওই দুটি টিস্যুর মাঝবরাবর থাকে (যার নাম কর্পাস স্পঞ্জিয়াম)। এই শেষোক্ত টিস্যুটির অগ্রভাগ স্ফীত হয়ে অনেকটা বাল্বের আকার ধারণ করে। একে বলা হয় লিঙ্গের গ্ল্যান্স। স্নায়ুকোষের আধিক্যের ফলে যৌন মিলন বা হস্তমৈথুনের সময় লিঙ্গের গ্ল্যান্স যৌন আনন্দ প্রদান এবং অর্গ্যাসমে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নেয়। গ্ল্যান্স সাধারণত একটি ঢিলেঢালা ত্বকের মাধ্যমে ঢাকা থাকে। এই ত্বককে বলা হয় foreskin বা প্রিপিউস (prepuce)। এই ত্বক পিছিয়ে গিয়ে খুব সহজেই গ্ল্যান্স বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। লিঙ্গের নিচের দিকে যেখানে এই ত্বক লিঙ্গের সাথে আটকে থাকে তাকে বলা হয় ফ্রেনুলাম। অনেকের ক্ষেত্রেই প্রিপিউস কেটে বাদ দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে বলা হয় খতনা বা circumcision। লিঙ্গের তলদেশে অবস্থিত কর্পাস স্পঞ্জিয়াম টিস্যুর মধ্যে দিয়ে মূত্রনালী লিঙ্গের গোড়া থেকে অগ্রভাগ পর্যন্ত প্রসারীত হয়ে গ্ল্যান্সে অবস্থিত একটি ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এই ছিদ্রের মাধ্যমেই মূত্র ও বীর্য বাইরে বের হতে পারে।

খতনা বা মুসলমানি করানো কেন ভাল ? ঃ-

লিঙ্গের যে বাড়তি চামড়া ইংরেজীতে এই ত্বককে বলে ফোর স্কিন । যা লিঙ্গের সামনে একটি আবরণ ত্বক থাকে এবং ইহা কেটে ফেলাকেই খতনা বলে । খতনা করালে ক্ষতির চাইতে লাভ ই বেশি হয় বা যৌন ইনফেকশন জাতীয় অনেক অসুখ থেকে অনেক টা মুক্ত থাকা যায় । (যদি ও কেউ কেউ তা অস্বীকার করেন তবে নিরেপেক্ষ দৃষ্টিতে এর উপকার ই বেশি – খতনা মুলত প্রথম যোগ থেকেই ইব্রাহীম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত পুরুষ মুসলিম এবং ইহুদী ধর্ম অবলম্বনে করা বাধ্যতা মূলক । সদ্য প্রমাণিত বাচ্চাদের কিডনি অসুখ বা . ফিমোসিসি সহ (পরিণত বয়সে অগ্রভাগের চামড়া স্বাভাবিকভাবে না গুটানো বা শিশ্নের সাথে আটকে থাকা বা গুটিয়ে গেলেও ঠিকভাবে আগের অবস্থায় ফিরে না যাওয়া।) যারা প্রিফিউসের অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতায় (লিঙ্গের মুন্ডের উক্তেজনা যাদের বেশি) বীর্যপাত খুভ তাড়া তাড়ি হয়ে যায় তাদের জন্য খতনা করানো খুভি ভাল বলে প্রমাণিত । (হিস্ট্রি অব মেডি সাইন্স)

তবে কোন কোন দেশে মহিলাদের ও খতনা করা হয় (মহিলাদের ভগাঙ্কুরের অংশ কেটে ফেলা) যা কোন ধর্মীয় ভাবে বলা হয়নাই বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইহা ক্ষতিকারক হিসাবে প্রমাণিত । প্রমান তথ্য ভিত্তিক হিসাবে দেখা যায় মহিলাদের স্নায়ুবিক যৌন উক্তেজনার বাহ্যিক স্পর্শকাতর অঞ্চলের মধ্যে ভগাঙ্কুর অন্যতম এবং যদি কোন কারণে মহিলাদের উক্তেজনা কমাতে হয় তা হলে ভনাঙ্কুরের সম্মুখ ভাগ কেটে ফেললে অনেক টা স্পর্শকাতর জাতীয় উক্তেজনা কম থাকে যা স্বাভাবিক মহিলাদের চাইতে ৩০% কম অথবা যে সকল মহিলা সমকামী নেশায় আসক্ত তাদের সে অভ্যাস দূর করার জন্য কিছুটা ফলদায়ক । হয়তো সেই সুবাদে তখনকার পুরুষরা তাই করে, শেষমেশ রেওয়াজে পরিণত করেন । তবে ইহা অমানবিক ও সবাস্থের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় আন্তর্জাতিক আইনে ২০১২ সালে নিষেধ করে আইন ও পাস করা হয়েছে । (বিস্থারিত যৌন রোগ অধ্যায়ে জানতে পারবেন)

যৌন উত্তেজনার সময় সাধারণত লিঙ্গের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুইই বেড়ে যায় কেন ? ঃ–

ওই সময় লিঙ্গে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীসমূহ প্রসারিত হয়ে স্পঞ্জি টিস্যুগুলিতে অতিরিক্ত রক্ত সরবরাহ করে। এর ফলে ওই টিস্যুগুলো প্রসারিত হওয়ায় লিঙ্গ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বাড়তে থাকে। উপরন্তু স্পঞ্জি টিস্যুসমূহ প্রসারিত হয়ে লিঙ্গের শীরাগুলিকে চেপে দেয় যাতে ওই টিস্যুগুলি থেকে শীরার মাধ্যেম রক্ত কম পরিমানে অপসারিত হয়। ফলস্বরূপ বেশি পরিমানে রক্ত লিঙ্গে প্রবেশ করে কিন্তু অল্প অপসারিত হয়। এটা চলতে থাকে যতক্ষন না একটি সাম্যাবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে, যাতে করে উত্তেজিত লিঙ্গের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একটি নির্দিষ্ট মানে বজায় থাকতে পারে। এই ঘটনাকেই বলা হয় ইরেকশন (erection) যা যৌনমিলনের জন্য প্রয়োজনীয়। উত্তেজিত অবস্থায় লিঙ্গের দৈর্ঘ্য গড়ে প্রায় ৫ থেকে ৬ ইঞ্চি পরিমান হয়। তবে ব্যাক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে এই মান ৪ ইঞ্চি থেকে ৭.৫ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। সব থেকে দীর্ঘতম লিঙ্গের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১৩.৫ ইঞ্চি। তবে এখানে উল্লেখ্য যে অনুত্তেজিত অবস্থায় লিঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর উত্তেজিত দৈর্ঘ্য কখওনোই নির্ভর করেনা। আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, ব্যাক্তির শরীরের বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপরেও উত্তেজিত লিঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ভর করেনা। লিঙ্গের গড় পরিধি প্রায় ৪.৮ ইঞ্চি মত। উত্তেজিত অবস্থায় লিঙ্গের কোন একদিকে বেঁকে যাওয়াটা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এছাড়াও দেখা যায় যে অনেকের ক্ষেত্রে উত্তেজিত লিঙ্গ উপরের দিকে, অনেকের নিচের দিকে কিংবা অনেকের আবার ভূমির সমান্তরালে মুখ করেও অবস্থান করে ইহা স্বাভাবিক বিষয় বা এর জন্য মন খারাপ বা ভয়ের কিছু নাই । (আর ও বিস্তারিত জানতে যৌন রোগে অধ্যায়ে দেখুন)

পুরুষদের সেক্স সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা (ডকুমেন্টরি)
অনলাইনের বিভিন্ন উক্তেজনাকর অসামাজিক উক্তেজিত ভিডিও, ছবি,পোস্টার ও লিফলেট চোখে পড়ে তার মধ্যে সেক্স সমস্যা নিয়ে লিখা দেখে উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রবল উক্তেজনা তৈরি হতে পারে , ফলে অনেকে নিজের যৌন অভিজ্ঞতা ঠিক আছে কিনা, যাচাই করতে প্রবল আগ্রহের সাথে বিভিন্ন হোটেলে, বান্ধবী বা প্রেমিকার সঙ্গে হোটেলে বা অন্য এলাকায় গিয়ে নিজের যৌনক্ষমতা পরীক্ষা করে। আর তখনই বিপত্তি শুরু হয় বা সদ্য তরুণরা অনেকে সময় বিপাকে পরে চরিত্র হরনের মত কাজ করে , যা কখন ও একজন বিবেক বান প্রাণী হিসাবে করা উচিৎ নয় বা সামাজিক ধর্মীয় ভাবে অত্যান্ত ঘৃণিত কাজ । মেডিক্যাল সাইন্সে ও প্রমান সহকারে ইহা অত্যান্ত খারাপ বলে বিবেচিত । যেমন যারা প্রথম অবস্থায় এ সব করে তাদের স্বভাবতই নিম্নের বিষয় সমূহ থাকবেই – এর শুরুতে নানা ধরনের টেনশন, বিভিন্ন ধরনের নেগেটিভ চিন্তা লিঙ্গের সাইজ নিয়ে, ক্ষমতা নিয়ে, শক্তি নিয়ে, বিয়ে নিয়ে, সন্তান হওয়া নিয়ে, স্ত্রী থাকবে কিনা, স্ত্রীর সামনে লজ্জা পেতে হবে কিনা? সোজা কথায়, একজন সু পুরুষ বা সু রমণী হিসাবে যা থাকার কথা টেস্টারন ও লিঙ্গের যএ থএ উত্থানের ফলে অনেকের প্রাকৃতিক পর্যায়ের সুখ শান্তি ব্যাহত হয়ে থাকে ৩০% মত বা শেষ মেষ পারিবারিক ভাবে বেশ বেগ পেতে হয় বা দাম্পত্য জীবন তৈরি করার পর যৌন মিলনে অশান্তি পেয়ে থাকেন ৯% মত, অন্য এক রিসার্চে দেখা যায় যারা এ ধরণের অপবাধ মূলক করমকান্ড যেমন, রাস্থা ঘাটে, অনলাইনে, স্কুল কলেজ ইত্যাদি জায়গায় উত্তাক্ত করার মত কাজে যারা সব সময় যোক্ত থাকে তাদের বেলায় নিজের দাম্পত্য জীবনে স্বামী থাকলে শ্রীর প্রতি এবং শ্রী থাকলে স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসের প্রবনতা ৪৩% বেশি থাকে (রিসার্চ, হ্যাপি লাইফ) । যদি ও ইহা মানসিক দুর্বলতা এবং পুরুষ ব্যাক্তিত্তের অপবাদ ! একটু বেশি । তাই এ সব কাজ থেকে দূরে থাকলে ১০০% নিশ্চয়তা দিয়ে বলা সম্বভ বিবাহের পরে একজন তরুন, তরুণীর কাছে হিরো হিসাবে থাকবেই সারা জীবন ভর । প্লাস পয়েন্ট হিসাবে সামাজিক ,ধর্মীয় ও আইনের নিতিবোধের প্রতি সম্মানিত থাকলেন সব সময় ।
চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঃ–

এই সব বিষয়ে যারা জড়িত ৭৫% সম্বাভনা আছেই নিম্ন লিখিত অসুখ বিসুখে আক্রান্ত হওয়ার বা অনেকে মনে করেন বয়সে একেবারে কম তাই সেক্সুয়েল ট্রান্সমিশন জাতীয় অসুখ থাকবেনা ! সেই ধারনা ও ভুল, ঃ বি ভাইরাস (কার শরীরে আছে বলা মুস্কিল বা ের লক্ষ্মণ অনেক বছর পর ও ধরা পড়ে বিধায়), সিফিলিস, এইডস ভাইরাস, গনরিয়া সহ মারাত্মক অন্যান্য যৌন রোগের সংস্পর্শের ভিতরে চলে আসতে সময় লাগেনা , যদি ও প্রথম অবস্থায় তা বুজা যায়না কিন্তু কয়েক বছর পর এমনিতেই তা ধরা পরে । এ ছাড়া যদি ভাগ্যগুনে এ সব অসুখ না থাকে, তারপর ও অন্যান্য ব্যাক্টোরিয়া জাতীয় জিবানু সংক্রামণ অসুখ থাকবেই । বিশেষ করে বয়স্কদের বেলায় ৩২% বেশি থাকে (ট্রান্সমিশন ইনফ টেক)
সেই সাথে অনোরুধ থাকবে নিম্নের বিষয় সমূহ এড়িয়ে চলা ঃ- ৭০% তরুন্দের বেলায় বয়োসন্ধিকালে হস্তমৈথুনের কারণে শরীর থেকে সমস্ত স্নায়ুবিক উক্তেজনা থমকে দাঁড়ায় বা অনেকের অঙ্গের ঠিক মত বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে (এর বিশেষ কিছু নিয়ম জানা নেই বলেই তরুণদের মধ্য বয়সে এসে বা বিবাহ করার সময়ে খুভ গুরুত্বর সমস্যার বা অসুখের সম্মুখিন হতে হয়) হরমোনের কর্মক্ষমতা কমে যায় বা অনেকের শরীর ভেঙ্গে যায় । সে জন্য তা অভ্যাসে পরিনিনত না করা ভাল ।-
পর্নোগ্রাফি বা এডাল্ট উক্তেজক বিষয় সমূহ ঃ

সদ্য প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা হয়েছে যারা বিভিন্ন ধরনের পর্নোগ্রাফি, অনলাইন এডাল্ট চাট বা ঐ জাতীয় কিছু করেন তাদের যৌন অনুভুতি ৪০% কমে যায় বা জীনগত পরীক্ষায় প্রমাণিত উক্ত পুরুষের আচরণ তার সন্তানের উপর প্রভাব বিস্থার করে । তাই এসব না দেখা ভাল, কারন এডাল্ট ছবি সমূহ আর বাস্থব জীবন চিত্র সম্পুন ভিন্ন , অন্য দিকে মেডিক্যাল সাইন্স অনুসারে এই জাতীয় অভ্যাসী তরুণদের গ্রন্থির ক্ষরিত রসের সাথে অথিরিক্ত ফ্রুকটোজ বাহির হয়ে যায়, যার ফলে উক্ত তরুণদের পরবর্তী পর্যায়ে শুক্রাণু দুর্বল হয়ে পড়ে সে জন্য তার দেওয়া শুক্রাণু থেকে জন্ম নেওয়া শিশু অনেক ধরণের মানসিক ভারসাম্যতা, ও মেমোরি শক্তি কম হওয়ার সম্বাভনা ৪০% বেশি থাকে । (আমরা যে কোন শিশুর পুস্টি হিনতার জন্য সব সময় শুধু মহিলাদের কে দোষারোপ করে থাকি । আসলে জিনেটিক সাইন্স অনুসারে ইহা ও সম্পূর্ণ সঠিক নয় এবং এর মধ্যে পুরুষরা ও ২১% দায়ি যার মধ্যে শুক্রাণুর দুর্বলতা ও একটি প্রধান বিষয়) । এ ধরনের অভ্যাসি তরুণদের দেখতে চুক্ষু কোটার গহ্বর সব সময় নিচের দিকে দাবিত থাকে এবং শরীরের যোগল মাংসপেশি সময়ের আগেই শুকিয়ে যায় । অন্য এক রিসার্চে দেখানো হয়েছে, যারা প্রায় সময় এসব দেখে অভ্যস্ত তাদের যৌন উদ্দীপনা ৩০% কমে যায় স্বাভাবিক নিয়মের চাইতে বা ৫৫% বেলায় খুভ দ্রুত বীর্যপাত পাতের মত ঘটনা ঘটে । কারন মস্থিস্কের হাইপোথ্যালামাস সঠিক ভাবে সঠিক সময়ে অণ্ডকোষের কাছে সঙ্কেত পাঠাতে পারেনা বিধায় অনেক ধরণের অসুবিধা দেখা দেয় । যারা অর্ধ বয়স্ক তাদের জন্য দুঃসংবাদ হল, তিনিদের ৩০% বেলায় পরবর্তীতে যৌন আগ্রহ হ্রাস পায় বলে প্রমাণিত । সুতারাং ইহা সাময়িক উক্তেজনা বৃদ্ধির উৎপাদক ছাড়া বাদ বাকি সব দিক দিয়ে অত্তান্ত খারাপ বলে প্রমাণিত (ডেইলি মেডিক্যাল সাইন টেক ইনফ)
যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট বা নেশা জাতীয় দ্রব্য না খাওয়া (সিগারেট বা তামাক ও এর আওতায় পরে) ঃ–

অনেকেই স্বাভাবিক যৌন কর্মের সক্ষমতা থাকা সত্তেও ভিন্ন উক্তেজক ঔষধ খেয়ে থাকেন বিনা কারণে , তাও মারাত্মক ভুল বলে প্রমাণিত বরং এ ধরণের অভ্যস্ততায় মধ্য বয়সে যৌনতার ভাটা পরে ৬০% বেলায় (প্রমাণিত) । এ ছাড়া অন্যান্য নেশা দ্রব্য গ্রহন কারীরা (যেমন ফেনসিডিল, ইয়াবা, গাঁজা, হেরোইন, মদ ইত্যাদি) যৌন শক্তি লোপ সহ শরীরের ইমিউনিটি সহ স্নায়ু কোষ সমূহ ধংশ হয়ে যায় খুভ তাড়া তাড়ি (ড্রাগস রিয়েকশন অধ্যায়ে বিস্থারিত)

সামাজিক প্রথা শিক্ষা জাতীয় ঃ

কেউ কেউ বন্ধু-বান্ধবীর কাছ থেকে সেক্স সংক্রান্ত ভুল তথ্য শিক্ষা লাভ করেন বা যারা শিখান তারা খুভ মজা করেন , অথচ আপনার এই মজা করার কারণে একটা বন্ধুর জীবনের সুখ নস্ট করে দিবেন তা মনে রাখা উচিৎ তাই শিক্ষণীয় বিষয়ে ফান না করা ভাল । এ ছাড়া অনেক তরুন তরুনি পরিবেষ ও কুলিন্নতার কারণে অনেক সময় ভাল কিছু শিখতে বা চাইলে ও সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে , তাই তাদের জন্য স্রদ্ধার সহিত অনুরোধ থাকবে বাজারের উক্তেজিত যৌন বিষয়ে লিখা সমূহ অনুসরণ না করে বিজ্ঞান ভিত্তিক লিখা সমূহ অনুসরণ করার জন্য । সেই সাথে – কিছু অবসেস্ট বা লোভি ধরনের ছেলে-মেয়ে বা বন্ধুদের কাছ থেকে (একেবারে মূর্খ আবার বয়সে এডাল্ট) দূরে থাকার চেস্টা করবেন , ইত্যাদি ।

প্রথম অবস্থায় যাহারা এই সব বিষয় মাথায় আনেন তাদের সচারচর যে সব অসুখের লক্ষ্মণ দেখা দিতে পারে ঃ–

রোগীদের অভিযোগ থাকে প্রস্রাব দিয়ে ক্যালসিয়াম যায়, ধাতু যায়, শরীর ক্ষয় হয়ে যায়।

কেউ কেউ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়, ফিট হয়ে যায়, বার বার মূর্ছা যায় বা অতিরিক্ত আবেগের ফলে সেক্সের সমস্যার কারণে অনেকে অবসেশনের মতো হয়ে যাওয়া ।

আবার কারও মধ্যে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা, পেট ব্যথা, মাথাব্যথা, তলপেটে ব্যথা, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, কিটকিট করে কামড়ানো ইত্যাদি থাকে।

লিঙ্গ ছোট-বড়, সম্মুখভাগ চিকন নিম্নভাগ মোটা, এই রকম হাজারো উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসতে থাকা বা তার মাথায় সব সময় লিঙ্গ নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক চিন্তা কাজ করছে ইত্যাদি

অনেকে চুপচাপ থাকে, কোন কথা বলে না, কাজ করে না, ঘুম হয় না। সব কিছুতেই নেগেটিভ চিন্তা জীবন নিয়ে, ভবিষৎ নিয়ে, সংসার নিয়ে। ধীরে ধীরে বিষন্নতার দিকে ধাবিত হয় এবং আত্মহত্যার প্রবণতা নিয়ে আসে।

অভিবাভকরা যা করেন ঃ (অভিবাবকরা বিরত থাকবেন এই সব চিন্তা থেকে)

বীর্য যাতে নষ্ট না হয় এই ভয়ে অনেক বাবা-মা ছেলেকে বিয়ে করিয়ে দেন বা মনে করেন ছেলে বা মেয়ে মানসিক ভাবে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে ইত্যাদি যা সম্পূর্ণ ভুল ধারনা । (যদি সে উপযোক্ত বয়স এবং সামাজিক ও সংসার সম্বন্ধে বুজার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে তা হলে বিয়ে করানোই ভাল , তারপর ও আর্থিক সচ্ছলতার উপর নির্ভর করে সব কিছু ।) কেউ কেউ এই সব সমস্যা নিয়ে ফকির-কবিরাজ, বিভিন্ন ডাক্তার দেখিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যান , যা মোটেই করা উচিৎ নয় । তারপর ও যদি বুজতে হয় তা হলে ভাল মানসিক ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ কে দেখালে তিনি সঠিক পরামর্ষ বা সমাধার পথ বের করে দিবেন ।

অভিবাবক কে তার সন্তানের জন্য যা করা উচিৎ এই সময় ঃ-

সেই ছেলে বা মেয়ে কে নিজ ধর্মীয় উপদেশ সমূহ মেনে চলার জন্য চাপ প্রয়োগ করা – সামাজিক দায়িত্ব বা সাংসারিক কিছু কাজ কর্মের চাপ বাড়িয়ে দেওয়া । লেখা পড়া করতে থাকলে সে দিকে ভাল কিছু করার জন্য উৎসাহ জোগিয়ে, সে দিকে দাবিত করা । কিছু ঝাঁজালো বন্ধু বান্ধব থাকলে তাদের সং ত্যাগ করার চেস্টা করা এবং ভাল বন্ধুদের সাথে চলতে দেওয়া । খেলা ধুলা বা ভিন্ন সামাজিক সহযোগিতামূলক কাজে সাহায্য করার জন্য উৎসাহ দেওয়া ইত্যাদি । যাহাতে সে নিজে নিজেই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে । ৯৯% ভাবে বলা যায় ে ধরণের ভোক্ত ভোগিরা যে কোন ভাবে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ও বদ অভ্যাস পরিবর্তন করলে তা সেরে যাবে যা চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই সব বিষয় কে অসুখ বলা হয়না বরং বদ অভ্যাসী ছেলে বা মেয়ে বলা হয় ।

টেস্টারন (ডাঃ হেলাল কামালি)

টেস্টারন কি ঃ (brand name for testosterone formulations); 4-androsten-17β-ol-3-one.)

ইহা একটি যৌন হরমোন যা পুরুষের বেলায় টেস্টিস বা অণ্ডকোষ এবং নারীদের বেলায় ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয় (কিছু কিছু টেস্টারন এড্রিনাল গ্লেন্ড থেকে আসতে দেখা যায়, যা মহিলাদের বেলায় হয়ে থাকে , যেহেতু তাদের অণ্ডকোষ নাই) । পুরুষের ক্ষেত্রে এই হরমোন তার যৌবন সূচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরুষত্ব কে সঠিক জায়গা মত ধরে রাখতে অত্তান্ত গুরুত্ব পূর্ণ ভুমিকা পালন করে । টেস্টোরন হরমোন, পুরুষ হরমোন হলেও নারী-পুরুষ উভয়ের দেহে টেস্টোসটেরন উৎপাদিত হয়। পুরুষদের দেহে পুরুষালি লক্ষণ যেমন কণ্ঠস্বর ভরাট, দাড়ি-গোঁফ গজানো এবং মাংসপেশির প্রশস্ততা,মহিলাদের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর শক্তির উর্বরতা ইত্যাদি এই হরমোনের কারণে দেখা দেয়। টেস্টোসটেরন হরমোন পুরুষদের যৌন অনুভূতি, চেতনা ও পুরুষাঙ্গের উত্থান ক্ষমতা বা পুরুষের সেক্সুয়েল উগ্রতা, বিশেষ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। (অবশ্য সেই সাথে dihydrotestosterone হরমোন ও প্রয়োজন) ।

মহিলাদের বেলায় ওভারিতে মহিলা সেক্স হরমোন ইস্ট্রোডেল কে সুন্দর ভাবে রুপান্তর করতে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ তবে

মহিলাদের বেলায় এর পরিমাণ ও খুভি কম থাকে এবং সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মহিলা সেক্স হরমোন (বিশেষ করে প্রোজেস্টারন কে) নিয়ন্ত্রণ করে ।
কিভাবে টেস্টারন কাজ করে ?
টেস্টারন খুভি সুক্ষ ভাবে শরীরের রক্তের মান নিয়ন্ত্রণ কে রক্ষা করে বিধায় সকালের রক্ত পরীক্ষায় এর সর্ব উচ্চ ফলাফল আসা করা যায় । সাধারণত হাইপোথ্যালামাস এবং পিটুইটারি অণ্ডকোষের উৎপাদিত মোট টেস্টারন কি পরিমাণ বাড়াবে কমাবে তা নিয়ন্ত্রণ করে । যখন অণ্ডকোষে টেস্টারনের ঘাটতি মনে করে ঠিক তখনি গোনাডট্রপিক হরমোন luteinising উৎপাদন করে রক্তে পাটিয়ে দেয় এবং সেখান থেকে টেস্টিস সেই রেস্পন্সে সারা দিয়েই টেস্টারন উৎপাদন করে । যদি কোন কারণে অণ্ডকোষে তা রেসপন্স করতে ব্যাথ হয় তা হলে পুরুষ বা মহিলাদের , কিশোর বয়সে যৌন অঙ্গের ভিন্ন ত্রুটি সহ বন্ধ্যত্ব এবং পূর্ণ বয়স্কের বেলায় খুভ তাড়া তাড়ি বার্ধক্য দেখা দিতে পারে বলে মনে করা হয় ।
টেস্টারন কম হলে কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে ?
এই হরমোনের অভাবে পুরুষদের মাংসপেশি ও হাড় দিন দিন দুর্বল হয়ে যেতে পারে। সেই সাথে এর অভাবে ও স্বল্পতায় যৌন উদ্দীপনা ও আগ্রহ এবং ক্ষমতা এবং বিশেষ করে পুরুষাঙ্গের উত্থান ক্ষমতা কমে যেতে পারে। বাইরে থেকে প্রয়োগকৃত হরমোন ব্যবহারে এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। কারণ এর ফলে হরমোনের স্বাভাবিক মাত্রা বজায় রাখা যায় কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী বিধায় চেস্টা করবেন ন্যাচারেল ভাবে শরীরে টেস্টারন যে ভাবে উৎপন্ন হয় সেই ব্যাবস্থা করার ।
টেস্টারনের অধিক মাত্রায় কি দেখা দিতে পারে ? ঃ-
যদি বয়স প্রবৃদ্ধির আগে ছেলে বা মেয়েদের বেলায় টেস্টারন একটু বেশি দেখা যায় তা হলে খুভি তাড়া তাড়ি তার যৌন অনুভূতির অঙ্গ সমূহ বৃদ্ধি পেতে পারে বা তার আচার আচরণ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু ভিন্ন রকম দেখতে মনে হবে (false growth spurt) এবং মহিলাদের টেস্টারনের মাত্রা বেশি হলে মুখে দাঁড়ি , কণ্ঠস্বর পুরুষের মত , খুভ বেশি মুখে ব্রুন হওয়া, মাথার সম্মুখভাগের চুলের গোড়া থেকে রক্ত ঝরা সহ পুরুষের মত অন্যান্য আচার আচরণ দেখা দিয়ে থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে ওভারিয়ান ক্যান্সার হতে ও দেখা যায় (যদি হঠাত করে দেখা দেয়) ওপর দিকে পুরুষ দের বেলায় অতিরিক্ত টেস্টারনের মাত্রা দেখা দিলে , পুরুষ বন্ধ্যাত্ত , যৌন শক্তি হ্রাস , পুরুষ স্তনে মেদ বহুল বৃদ্ধি , স্বভাবের পরিবর্তন (কটোর উগ্র মিজাজি) প্রস্টেট গ্রন্থি বড় হওয়া , দেহের চর্বি কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া সহ হৃদরোগের মত অন্যান্য মারাত্মক অসুখ দেখা দিতে পারে ।

টেস্টারনের স্বাভাবিক মাত্রা ঃ– পুরুষের 300 -1,000 ng/dL এবং মহিলার 15 – 70 ng/dL (ng/dL = nanograms per deciliter)
চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে- চিকিৎসকরা টেস্টারন ঔষধ হিসাবে যে যে কাজে ব্যাবহার করে থাকেন ঃ–

পুরুষ ঃ (বালকদের বেলায়) এর বৃদ্ধি তে খুভ ছোট বয়সে পুরুষত্বের সকল লক্ষ্মণ দেখা দেওয়া অথবা এর কমতিতে খুব দেরিতে পুরুষত্ব দেখা না দেওয়া । বিশেষ করে তখন তার বাহু এবং পায়ের মাংস পেশী সমূহ বেশ বড় দেখাবে শরীরের অন্যান্য অংশের চাইতে । (পুরুষ দের বেলায় গড়ে বয়স ১২ নিছে ছোট এবং ১৬ উপরে বড় ধরা হয়)
তরুন ও মধ্য বয়সী পুরুষদের বেলায় ঃ– মাতার টাক বেশি হওয়া বা চুল একেবারে ঝরে পড়া, পরুষের পুরুষত্বহীনতা , যৌন উক্তেজনা হারিয়ে ফেলা বা একেবারে কমে যাওয়া , পুরুষের হাড় একেবারে পাতলা হয়ে যাওয়া বা মাংসপেশি সমূহের খিল ধরা বা এর শক্তি কমে যাওয়া , অথবা বন্ধ্যাত্ত ইত্যাদি দেখা দিলে চিকিৎসকরা টেস্টারন ব্যাবহার করে থাকেন তবে অবশ্যই টেস্টারনের ভলিউম পরিক্ষা করে –
পূর্ণ বয়স্কদের বেলায় এর অভাবে ঃ- পুরুষত্বহীনতা , যৌন উক্তেজনা হারিয়ে ফেলা বা একেবারে কমে যাওয়া বা হঠাত করে যৌন শক্তির আগ্রহ একেবারে হ্রাস পাওয়া, শারীরিক ক্ষমতা হ্রাস, (decreased sex drive), শরীর দুর্বল হয়ে পড়া এবং পেশীর গঠন শিথিল হয়ে যাওয়া সহ মেমরি ক্ষতি এবং ঘুম সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
মহিলাদের বেলায় টেস্টারন বেশি বৃদ্ধি পেলে ঃ– স্তনের আকার একেবারে ছোট হওয়া , অতিরিক্ত চুল বৃদ্ধি (মুখ বা বুকে) , ভগাঙ্কুরের (clitoris) আকার অতিরিক্ত বেড়ে গেলে , অনিয়মিত মাসিক- বিশেষ করে মাসিকের উপস্থিতি একেবারে কমে গেলে ,পুরুষ প্যাটার্ন টাক বা চুল পাতলা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি
সর্বশেষ তথ্য ঃ-

যদি ও পৃথিবীর সর্বত্র বার্ধক্যজনিত অসুখের কাছা কাছি প্রায় পুরুষরা শারীরিক ক্ষমতা হ্রাস, (decreased sex drive), শরীর দুর্বল হয়ে পড়া এবং পেশীর গঠন শিথিল হওয়ার মত অবস্থা দেখা দিলে বা শরীর ধরে রাখার জন্য, টেস্টারন হরমোন জাতীয় ইঞ্জেকশন দেওয়ার জন্য খুভ বেশি ব্যাস্থ হয়ে পড়েন বা ৭০% বেলায় বার্ধক্য জনিত অসুখের প্রথম স্থরে ভাল কাজ করে একমত বলা গেলেও এর অপরিকল্পিত ব্যাবহারে প্রস্টেট ক্যানসার হওয়ার ঝুকি ও বেশি সেই কথাটি ভুলবেন না বা এই সব ড্রাগসের ব্যাবহার অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্ষ ছাড়া ব্যাবহার করবেন না ।
টেস্টারন বৃদ্ধি করতে পারে এমন সব কিছু প্রমাণিত ভেষজ ঃ
(হরমোন কে ডায়রেক্ট কোন ভেষজ বা ঔষধ উৎপাদন করতে পারেনা, সে জন্য ২৯- ৩৯ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় । আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে কোন পুস্টিকর খাবার বিশেষ করে প্রোটিন ও ভিটামিন জাতীয়

খাবার ঠিক মত গ্রহন করলে প্রাকৃতিক উপায়ে এমিনিতেই শরীরের হরমোন পুরন করবেই । তবে আর ও ভাল হয় সেই সাথে যদি নিত্ত দৈহিক কাজ করেন যা (পেশি শক্তির কাজ), তা হলে মেটাবলিক প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়ে আর ও ভাল হবে । তারপর ও পৃথিবীর সেরা কিছু কিছু ভেষজ ও সাপ্লিমেন্ট জাতীয় ঔষধি নিছে তুলে ধরলাম) ঃ-
যদি একান্ত ভাবেই আপনার হরমোনের প্রয়োজন হয় তাহলে, এসব ঔষধি গ্রহন করার সাথে সাথে আপনার উচিৎ মাংসপেশির ব্যায়াম করা (বা যে রকম কাজ করলে আপনার শরীরের মাংস পেশী সমূহ শক্ত ও মজবুত থাকে তাই করা উচিৎ এবং দেখবেন কয়েক সপ্তাহের ভিতর আপনার শরীরের হরমোন এমনিতেই বৃদ্ধি পাবে -নিচের ঔষধি বর্তমানে পৃথিবীর সেরা স্পটস সেন্টারে খুভ বেশি সমাদ্রিত বা স্পটস মেডিসিনের আওতাভোক্ত — বা এই সব ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুভি কম)
D-Apartic Acid ঃ- যদি প্রতিদিন সকালে দৈনিক ৩ গ্রাম করে একটানা ৩ সপ্তাহ খেতে পারেন (যা বাজারে বা স্পোর্টস সেন্টারে D-Apartic Acid ট্যাবলেট হিসাবে পাওয়া যায় – বা প্রয়োজনে একজন পুস্টি বিশেষজ্ঞের পরামর্ষ নিতে পারেন) ইহা খুভি তাড়া তাড়ি অন্যান্য হরমোনের সাথে মিশে গিয়ে টেস্টারন হরমোন কে বৃদ্ধি করে- ৭১% কার্যকর একটি সাপ্লিমেন্টারী ঔষধ (প্রমাণিত – মেডি ল্যাব)
Tribulus Terestris নামে একটি ভেষজ ঔষধ (বাজারে ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়। যদিও বর্তমানে বাজারে ের অনেক নকল ঔষধ বাহির হয়েছে, সে জন্য আসল ব্যান্ড দেখে কিনবেন) দৈনিক 300-600mg কয়েক সপ্তাহ খেয়ে দেখতে পারেন (ইহা পিটুইটারি গ্লেন্ড কে স্টিমোলেট করে টেস্টারন হরমোন বৃদ্ধিতে বেশ ভাল কার্যকর প্রমাণিত – মেডি ল্যাব)
ZMA ট্যাবলেট (এক ধরণের জিঙ্ক) ঃ- ঘুমানোর ৩০ মিনিট আগে প্রতিদিন একটি করে খেলে ভাল উপকার পাওয়ার কথা (ZMA is a testosterone boosting products consisting of three different ingredients. ZMA stands for: Zinc (as l-monmethionine and aspartate), Magnesium (as aspartate), and Vitamin B6 (as pyridoxine HCL)
Longjack ট্যাবলেট (বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, যদি ও খুভ দামি তারপর এখন পৃথিবীর সর্বত্র বেশ সমাদ্রিত একটি ভেশজ ঔষধ) প্রতিদিন 200-600mg বা ১ টা করে দুইবার খেতে পারেন – (ক্যানাডিয়ান কোম্পনির ঔষধ সমূহ বেশ উন্নত)
বাংলাদেশ বা সাউথ এশিয়ান অঞ্চলের উদ্ভিদ Fenugreek বা মেথি বীজ বেশ কার্যকর বলে দাবী করা হয়েছে (ইন্ডিয়ান রিসার্চ ল্যাব) কেন না মেথি বীজে থেকে নিষ্কাশিত হয় অ্যামিনো অ্যাসিড, (4 hydroxyisoleucine) , OH-LLE অ্যামিনো, ট্রিপটোফেন, choline, নিয়াসিন, পটাসিয়াম, এবং অ্যাসকরবিক অ্যাসিড সমূহ সে জন্য হরমোন উতপাদনের বেশ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । অন্যদিকে ইহা পটাসিয়াম এবং নিয়াসিন ইমিউন সিস্টেম এর ক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মহিলাদের দুধ বৃদ্ধিতে ও সহায়ক । প্রতিদিন মেথি বীজের ট্যাবলেট ৫০০ মিঃগ্রাঃ করে ২৮ দিন খেয়ে যেতে পারেন (The herb Fenugreek is native to southern Europe and western Asia, and it is a herb similar to Tribulus Terrestris. One study on 30 young males indicated that 500 mg of Fenugreek increased total and free testosterone by 7% and 12%, respectively. This isn’t a big increase, but it also seems that Fenugreek inhibits the conversion of testosterone to DHT and estrogen.)
এবারে জেনে নিন কি ধরণের খাবারে সবচেয়ে বেশি টেস্টারন হরমোন শরীরে পরোক্ষ ভাবে উৎপাদনে সহায়তা করে ঃ–
ভিটামিন সি জাতীয় খাবার (কারন ভিটামিন সি একটি এন্টিটক্সাইড বিধায় শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেম কে বাড়াতে সাহায্য করে , সেই হিসাবে করটিসল কে কমিয়ে বেসিক হরমোন বাড়িয়ে থাকে- অন্য দিকে আরেক গবেষণায় দেখা যায় ভিটামিন সি কিছু এনজাইম বৃদ্ধি করে আবার সেই এনজাইম টেস্টারন ও ইস্ট্রোন হরমোন সমূহ কে বাড়িয়ে দেয়)
ভিটামিন এ জাতীয় খাবার ঃ- (কারন ভিটামিন এ Sertoli কোষ কে বাড়িয়ে প্রচুর প্রোটিন -৪, (which transports IGF), androgen-binding protein (which transports androgens), সমূহ কে বাড়িয়ে দেয় – তখন এই হরমোন সমূহ টেস্টারন হরমোন সরাসরি অণ্ডকোষ থেকে উৎপাদন করতে সহায়তা করে তবে ভিটামিন এ ইস্ট্রোন হরমোন কে কমিয়ে দেয়)
ভিটামিন বি জাতীয় খাবার ঃ০ ভিটামিন সমুহের মধ্যে টেস্টারন হরমোন কে সবচেয়ে বেশি বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে বি৬ এবং বি১২ সে জন্য শিম সবুজ শাঁক সবজি, ডিম, ও ডায়েরী প্রোডক্ট জাতীয় খাবার খুভ বেশি খাওয়া ভাল ।
জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার ঃ- এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভাল টেস্টারন হরমোন কে বাড়ানোর জন্য জিঙ্ক জাতীয় খাবারের কথাই বলা হয় (গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ৯০% পুরুষের বেলায় যারা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জিঙ্ক খাবার গ্রহন করেন তাদের বেলায় টেস্টারন হরমোনের ঘাতটি খুভ কম । কেন না জিঙ্ক জাতীয় খাবার টেস্টিকুলার কোষ সমূহের শক্তি কমিয়ে লিপিডসে রুপান্তরিত করে এবং প্রচুর লিপিডস উৎপাদন করে পর্যায়ক্রমে টেস্টারন বাড়িয়ে দেয় – জিঙ্ক খাবার ঃ- লাল মাংস , কচি মুরগের বাচ্চা , বাদাম, বাদামি চাল, দুধ ইত্যাদি –
সবাধানতা ঃ– যদি রক্তে হাই কোলেস্টারল, উচ্চ রক্ত চাপ বা হার্টের মাংসপেশির কোন অসুখ থাকে তা হলে এ ধরণের খাবার অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে (পুরুষের যৌন রোগ অধ্যায়ে অন্যান্য বিষয় জানতে পারবেন) — ধন্যবাদ
স্ত্রী জনন তন্ত্রের গঠন এবং হরমোন (মহিলাদের জন্য) ————— (চলবে)

CATEGORIES স্বাস্থ্য ও জিবন • TAGS হরমোন ৪থ পর্বের - (খ) পুরুষ জননতন্ত্রের গঠন এবং পুরুষ যৌন হরমোন নিয়ে কিছু কথা-

ফরমালডিহাইড এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইড (Formaldehyde & calcium carbide)

PUBLISHED ON *August 17, 2014 by Health (স্বাস্থ্য) -Leave a comment*

i
2 Votes

(https://helalkamaly.files.wordpress.com/2014/08/for-2.jpg)

ফরমালডিহাইড এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইড (Formaldehyde & calcium carbide)

Ref:- prof. Ir Chanif Mahdi – ECU Environmental Health & Safety- Medical Toxicology Doctors and Physicians (UK) – NICRH Bangladesh – WHO (Created . Dr.H.Kamaly)

ফরমালিন হচ্ছে বর্ণহীন গন্ধ যোক্ত ফরমালডিহাইড (রাসায়নিক সংকেত ফর্মালিন (-CHO-)n হল ফর্মালডিহাইডের (CH2O) পলিমার) গ্যাস থেকে পানির সাথে মিশ্রিত একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রিজারভেটিভ – ইহা দেখতে সাদা – ১৮৫৯ সালে রুশ রসায়নবিদ আলেকজান্দর বুতলারভ ফরমালিনের অস্তিত্ব তাঁর প্রতিবেদনে তুলে ধরেন। পরবর্তীতে ১৮৬৯ সালে অগাস্ট উইলহেম ভন হফমেন স্বার্থকভাবে চিহ্নিত করেন। ফরমালিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংক্রমিত হতে না দেয়া। অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাককে মেরে ফেলতে পারে। সাধারণত ৩৭ থেকে ৪০ শতাংশ জলীয় দ্রবণই হলো ফরমালিন এবং কখন ও এর সাথে ১০-১২ ভাগ মিথানল ও মিশ্রিত করা হয় অতিরিক্ত প্রিজারভেশন ক্ষমতা বড়ানোর জন্য । (মিথানল হইতেছে কাঠের উপরের রঙে যে স্প্রিট ব্যাবহার করা হয় তাই । যা মানব দেহের জন্য খুভি ক্ষতিকারক এমন কি নিত্য প্রয়োজনিয় আসবাব পত্র, ল্যাবরেটরি, ইনাডস্ট্রি ইত্যাদিতে নির্দিষ্ট পরিমান ব্যাবহারের অনুমতি থাকলে এর বিশেষ কিছু বিধি নিষেধ আছে । যদিও ফরমালিন ভাল একটি প্রিজারভেটিভ কিন্তু পিজারভেটীভ এর ভিবিন্ন গ্রেড আছে। ফুড গ্রেড নন ফুড গ্রেড। নন ফুড গ্রেড গুলো খাওয়া যায় না আর সেগুলো চরম মাত্রায় বিষাক্ত। ফরমালিন হইল সেই নন ফুড গ্রেডের পিজারভেটিভ তাই খাদ্য দ্রবতে এর ব্যাবহার সম্পূর্ণ নিষেধ । তা ছাড়া বৈজ্ঞানিকভাবে মানুষের জন্য ফরমালিনের লিথাল ডোজ ৩০ মি.মি (ভিন্ন ব্যাবহারিক বস্তুতে) এবং বাতাসে ২পিপিএম-(পেইন্ট বা যে কোন ইনাডাস্ট্রি থেকে) বায়ুতে মিশ্রিত হলে তাও সম্পূর্ণ নিষেধ । ((Formalin is commonly used to describe a mixture of 37% to 38% formaldehyde in water. Formaldehyde is a gas. It has the formula HCHO or CH2O. A small amount of stabilizer, such as methanol 10-12%, is usually added to limit oxidation and polymerization)

ফরমালডিহাইড মেথড অনুসারে ভিন্ন নামে থাকতে পারে (যে কোন প্যাকেটে যদি এই সব যে কোন একটি নাম দেখতে পান তা হলে মনে করবেন ফরমালিন) ঃ Formic aldehyde- ethanediol –Methanal –Methyl aldehyde –Methylene glycol –Methylene oxide অথবা নিম্ন লিখিত কেমিক্যাল আইটেম সমুহ ও ফরমালিনের উৎপাদক বিধায় ইহা ও এক ধরণের ফরমালিন বলা হয় ঃ Benzylhemiformal –2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol –5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane –Diazolidinyl urea –1,3-dimethylol-5,5-dimethylhydantoin (or DMDM hydantoin) –Imidazolidinyl urea –Sodium hydroxymethylglycinate –Quaternium-15 । তাই এই সব কেমিক্যাল পদার্থ যে কোন খাদ্য দ্রব্যে লিখা থাকলে বা সন্ধ থাকলে তা থেকে দূরে থাকা উচিৎ

বৈধভাবে নির্দিষ্ট পরিমান ফরমালিন কি কাজে ব্যবহার করা হয় ঃ –

ফরমালিন সাধারণত টেক্সটাইল, প্লাস্টিক, পেপার, রং, কনস্ট্রাকশন, পোলট্রি ও হ্যাচারি শিল্প, ল্যাবরেটরি, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, কাঠ ও প্লাইউড শিল্প, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গবেশনায় , অ্যাগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি, সায়েন্টিফিক ল্যাব, ওষুধ কোম্পানি, ভ্যারাইটিজ কনজিউমার প্রডাক্ট, ট্রেডিং কোম্পানিসহ ব্যাবহারের প্রয়োজন বা মৃতদেহ সংরক্ষণে খুভ বেশী উপকারী একটি কেমিক্যাল । কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত বাংলাদেশ সহ কয়েক টি দেশে খাদ্যতে ফরমালিন ব্যাবহার করতে দেখা যায় যা কোন অবস্থাতেই স্বাস্থ্য সম্মত নয় – সেই সাথে খাদ্য দ্রবের সাথে সম্পর্ক যোক্ত কোন কিছুতেই ফরমালিন ব্যাবহার করে ঠিক নয় । যদিও কিছু কস্মেটিক ব্যাবহার সামগ্রী, নুখ পালিশ কিছু ক্রিম, শ্যাম্পু, সাবান ইত্যাদিতে ব্যাবহারের অনুমতি থাকলে ও তা ০.০২% ভিতরে থাকতে হয় । প্রাকৃতিক ভাবে কিছুটা ফরমালডিহাড্রেডের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তামাক জাতীয় সিগারেটে এবং আর ও বেশী ফরমাল্ডিহাইড্রেড উৎপন্ন হয় যারা সিগারেট নিভিয়ে আবার পান করেন । সেই সাথে যারা সিগারেট পান করেন না তাহারা ও আক্রান্ত হন ধূমপায়ীর শ্বাসের মাধ্যমে । (concentrations in cosmetics and other personal care products like lotions, shampoo, conditioner, shower gel, and some fingernail polishes. These may raise the concentration of formaldehyde in the air inside the room for a short time, but the levels reached are far below what is considered to be hazardous)

প্রথমে জেনে নিন আসবাব পত্র ও নিত্য ব্যাবহারিক জিনিসে বা শিল্প কারখানায় অতিরিক্ত ফরমালডিহাইড ব্যাবহারে কি ক্ষতি হতে পারে ঃ- ফরমালডিহাইড অতিরিক্ত ব্যাবহার যে সব আসবাব পত্রে করা হয় তার গ্যাস থেকে বাতাসের মাধ্যমে মানব দেহের শ্বাসের ছড়িয়ে পরে, ফুস ফুস, শ্বাস নালি, মুখ গহ্বরে আক্রান্ত হয়ে (শ্বাস তন্ত্র) ভিন্ন ধরণের প্রদাহ যোক্ত অসুখ বা তা থেকে (বিশেষ করে হাঁপানি ও নিউমোনিয়া বা গলার টনসিল জাতীয়- and cancer of the

nasopharynx বা cancer of the nasal sinuses. বা leukemia,) ক্যানসার সেল ডেবলাপ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুভ বেশী, সে জন্য উন্নত দেশে ফরমালডিহাইড অন্তর্ভুক্ত সকল কেমিক্যাল পদার্থ ব্যাবহার সিমিত করার জন্য ইতিমধ্যেই বেশ কড়া কড়ি আইন ও নিয়ম তৈরি করা হয়েছে এবং ফরমালিন জাতীয় কেমিক্যাল সুমহে যাহারা কাজ করেন তাদের জন্য ও বিশেষ নিয়ম ও সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাবস্তা করা দরকার (পেইন্টও প্লাস্টিক , চামড়া ইত্যাদির)

মুনাফালোভিরা সরা সরি ভিন্ন খাদ্যতে কেন ব্যাবহার করতে চায় – ফল মুল, মাছ ইত্যাদি কে বেশী দিন ঠিকিয়ে রাখার জন্য বা পচন রোধ করার জন্য ফরমালিন ব্যাবহার করে থাকে যা সভ্য সমাজে ভাবতেই অবাক লাগে তাই এ বিষয়ে সাধারণ জঙ্গনের সচেতনতা ও কঠোর আইনের প্রয়োজন । পৃথিবীর ১৩ টি দেশে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য নিয়ম বহির্ভূত ভাবে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন জাতীয় কেমিক্যাল পদার্থ মিশানো হয়ে থাকে তার মধ্যে বাংলাদেশ সহ চিন, ভারত, থাইল্যান্ড, বার্মা, পাকিস্থানের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য । সম্প্রতি এক তথ্যে দেখা যায় এই সব অঞ্চলে, (ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্স অন ক্যান্সারের ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার রিপোর্টের দেয়া তথ্যমতে) , ১৯৭৫ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ক্যান্সারের হার দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে তা আবারও দ্বিগুণ হবে এবং এ হার তিনগুণে পৌঁছবে ২০৩০ সালের মধ্যে। যদি ও সারা বিশ্বে প্রতি বছর ১.৩ শতাংশ হারে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়তেছে । তবে দুঃখ জনক হলেও সত্য – বাংলাদেশ ও তার আশে পাশের দেশ সমুহে এর বৃদ্ধির হার ২.৮ শতাংশ এবং মুল কয়েক টি কারনের মধ্যে প্রধান কারন ই হল সকল ধরণের খাদ্যে দ্রব্যে বিষাক্ত কেমিক্যাল পদার্থের সংমিশ্রণ করে বাজারজাত করা । অন্য এক তথ্যে দেখা গেছে, ভেজাল খাদ্য খেয়ে দেশে প্রতি বছর তিন লাখের বেশি মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। প্রায় দেড় লাখ মানুষ ডায়াবেটিস ও ২ লাখ কিডনি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও গর্ভবতীরা। ভেজালের কারণে গর্ভবতী মায়ের শারীরিক জটিলতাসহ প্রতি বছর গর্ভজাত বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা কয়েক লাখ। (ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড) আরও বাস্তব প্রমান অনুসারে নিশ্চিত ভাবে বলা হয়েছে , বাংলাদেশে ক্যান্সার প্রতিরোধক ঔষধের বাজার প্রতি বছর শতকরা ২০ ভাগ হারে বেড়েই চলছে যেখানে বিগত নব্বই শতকে মাত্র ৩% ছিল ।

(ইন্টারন্যাশনাল কেমিক্যাল ইম্পোরট ডাটা ভিত্তিক তথ্য)

বাংলাদেশের গত বছরে ফরমালিন আমাদানি কৃত ডাটাতে দেখা গেল দেশের শিল্প প্রতিস্টান ও হাসপাতালের চাহিদা ছিল ২০১২/১৩ সালে ৭৫ টন সেই খানে আমাদানি করা হয় ৩০০ টনের মত । চলতি বছর দেশের চাহিদা ছিল ১০০ টনের সেখানে আমাদানি করা হয়েছে ৫০০ টন । গড়ে বাদ বাকি ৪০০ টন ফরমাল্ডিহাইড্রেট গেল কোথায় ? নিশ্চয় যেভাবেই হউক মানুষের পেটে !!! (আমার ব্যাক্তি গত অভিমত) সে জন্য দেশে যতই শক্ত আইন করা হয়না কেন কাজ হবেনা , যতক্ষণ গন সচেতনতা সহ ওদের প্রতি ঘৃণা না জন্মানো যাবে এবং সেই সাথে মুল ডিস্ট্রিবিউটার ও আমদানিকারকদের উপর কড়া নজর দারি সহ আইনের সঠিক প্রয়োগ সব সময় প্রয়োজন । তাহলে কিছু টা প্রতিরোধ হতে পারে । কারন সাধারণ ফরমালিন যোক্ত খাদ্য দ্রব্য স্রব্রাহ কারিরা কারিরা অপরাধী নয়, তাই ওদের কে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে , সর্বস্ব জরিমানা ইত্যাদি করে তেমন লাভবান হওয়ার কথা নয় , বা এ ধরণের ভয়ে সামিয়িক কিছু টা উপকৃত হলেও ওরা পেটের জ্বালায় আবার এই কাজে লাগবেই । তাই ইহা জনগন কে না দেখিয়ে মুল জায়গায় ঠিক মত নক করলেই মনে হয় সবচেয়ে বেশী সুফলতা বয়ে আনবে ।

ফরমালিন স্বাস্থ্যের কি কি ক্ষতি করতে পারে ? – What are the health effects of Formalin ?

ফরমালিনের ব্যাবহারে কি কি অসুখ বা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে ঃপ্রাথমিক ভাবে ফরমালিন যুক্ত ফলমূলসহ অন্যান্য খাবার গ্রহণের ফলে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা নষ্ট, হাঁচি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা বদহজম, ডায়রিয়া, আলসার, চর্মরোগের উপদ্রব দেখা দেয় এবং পর্যায় ক্রমে যা দেখা দিয়ে থাকে ঃ- ফরমালডিহাইড চোখের রেটিনাকে আক্রান্ত করে রেটিনার কোষ ধ্বংস করে। ফলে মানুষ অন্ধ হয়ে যেতে পারে– এই রাসায়নিক পদার্থ লিভার, কিডনি, হার্ট, ব্রেন সব কিছুকে ধ্বংস করে দেয়। লিভার ও কিডনি অকেজো হয়ে যায়। হার্টকে দুর্বল করে দেয়। স্মৃতিশক্তি কমে যায়। ফরমালিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করার ফলে পাকস্থলী, ফুসফুস ও শ্বাসনালিতে ক্যান্সার হতে পারে। অস্থিমজ্জা আক্রান্ত হওয়ার ফলে রক্তশূন্যতাসহ অন্যান্য রক্তের রোগ, এমনকি ব্লাড ক্যান্সারও হতে পারে। এতে মৃত্যু অনিবার্য। মানবদেহে ফরমালিন ফরমালডিহাইড ফরমিক এসিডে রূপান্তরিত হয়ে রক্তের এসিডিটি বাড়ায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করে।

ফরমালিন ও অন্যান্য কেমিক্যাল সামগ্রী সব বয়সী মানুষের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ। তবে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে। ফরমালিনযুক্ত দুধ, মাছ, ফলমূল এবং বিষাক্ত খাবার খেয়ে দিন দিন শিশুদের শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে যায় বা কিডনি, লিভার ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট, বিকলাঙ্গতা সহ শিশুদের বুদ্ধিমত্তা দিন দিন কমিয়ে দিতে পারে ।গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রেও মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে। সন্তান প্রসবের সময় জটিলতা, বাচ্চার জন্মগত দোষত্রুটি ইত্যাদি দেখা দিতে পারে বা প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হতে পারে। অনেক সময় এ রকম ও দেখা যায়, কয়েক দিন

পরপর একই রোগী ডায়রিয়ায় ভুগছেন, পেটের পীড়া ভালো হচ্ছে না, ঘন ঘন চর্মরোগে আক্রান্ত হইতেছেন । অর্থাৎ দীর্ঘ দিন ফরমালিন বা ঐ জাতীয় কেমিক্যাল পদার্থ দীর্ঘদিন যাহারা খেয়ে থাকেন তিনিদের ৮৭% সম্ভাবনা আছেই পাকস্থলী, ফুসফুস , শ্বাসনালি, ও অস্থিমজ্জায় ক্যানসারের মত মারাত্মক অসুখ হওয়ার । (ল্যাব রিসাচ)

সর্বশেষ তথ্য অনুসারে পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা ঃ- যাহারা ৫.৬০ পিপিএম হতে ১৫প্পিএম পর্যন্ত ফরমালিন যোক্ত খাবার গ্রহন করবেন একনাগারে ২ বছর তাদের বেলায় ৯০% বেলায় শ্বাস তন্ত্র, পাকস্থলী বা লিভার ক্যানসার হবেই _ (ক্যানসার রিসার্চ ইন্সটি , ইউকে)

ফরমালিন যোক্ত খাবার চিনবেন কিভাবে (সংগৃহীত) ঃ

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয় , ফরমালিন যোক্ত খাবার কিভাবে চিনা যাবে সে জন্য হাজার খানেক মেইল পাঠাই আমাদের রিসার্চ লাইব্রেরী ও গবেষকদের কাছে । একমাত্র ভারত, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড চাড়া সবাই জানালেন ফরমালিন আবার খাবারে দেওয়া হয় নাকি ? বা জানেন না বা অনেকে উলটো অনুরুধ করেছেন আমি যেন তিনিদের কে জানাই কি কি খাবারে দেওয়া হইতেছে ইত্যাদি !!! তার পর ও নিজ দেশের সুনাম ধন্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার সম্প্রতি দেওয়া কিছু উপদেশ থেকে কিছু টা জানার চেস্টা করলাম ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে ফরমালিন বা অন্যান্য কৃত্রিম উপাদান ছাড়া খাবার খুভ কম আছে ইহা বলে লাভ নেই ,মনে রাখবেন খাবারে তাপের মাধ্যমে ফরমালিনের ক্ষতিকর প্রভাব নষ্ট হয় না বরং লিকুডেশন বাড়ে (তরলীকরণ) তারপর ও যত টুকু পারেন সতর্ক থাকতেই হবে বা অন্য কে সতর্ক রাখা মানবিক দায়িত্ব । এ ছাড়া ও যায় ফরমালিন ছাড়া ক্যালসিয়াম কার্বাইড , কপার সালফেট, কার্বনের ধোঁয়া, পটাশের লিকুইড সলিউশন, জ্বালানো মবিল, ডিডিটি এমন কি আলকাতরা বা ইউরিয়া শ্বার ও ব্যাবহার করে থাকেন সুবিধা ভোগী কিছু ব্যাবসিয়ারা – যা কল্পনা করার মত নয় এমন কি মাল্টি ন্যাশনাল কিছু কোম্পানিরা ও ব্যাবহার করিতেছে , যেমন ফলের রস, স্ন্যাক্সফুড, জ্যাম-জেলি, আচার-চাটনি, সেমাই ও নুডলস ইত্যাদিতে । তাই সুন্দর প্যাকেটের যোগে খাদ্য দেখতে সুন্দর হলেই যে ভাল হবে তাও বলা মুশকিল ।
১০০% নিশ্চিত ভাবে ফরমালিন দেওয়া খাদ্য দ্রব্য চুখে দেখে বলার মত নয়, সে জন্য কিছু ইলেক্ট্রনিক গ্যাস ডিটেক্টর আছে যা দিয়ে পরিক্ষা করলে ৯৫% নিশ্চিত হওয়া যায় বা বাজারে কিছু স্টিকার কিনতে মিলে তা দিয়ে পরিক্ষা করলে বুজা যায় , তাও সাধারণ জনগণের জন্য ব্যয় সাধ্য বিধায় আপাদত নিজের বুদ্ধি খাটিয়েই শাকসবজি, মাছ ইত্যাদি কিনতে হবে । (যদি ও কিছু দিনের ভিতরে খুভ সস্থা দামে এ সব স্টিকার বাজারে আসার কথা)

সাধারণ ভাবে ফরমালিন সনাক্ত করতে হলে ঃ

সন্দেহযুক্ত ফরমালিন মাছ ধুয়ে পানিতে ৩% (আয়তন) হাইড্রোজেন পারক্সাইড মেশালে ফরমালডিহাইড অক্সিডাইজড হয়ে ফরমিক অ্যাসিডে রূপান্তর হয়। ফরমিক এসিড প্রমাণের জন্য সে পানিতে অল্প মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশালে সাদা রঙের তলানি পড়বে। তাতেই প্রমাণ হবে ফরমিক অ্যাসিড তথা ফরমালডিহাইড তথা ফরমালিন। (ল্যাব) অথবা ফরমালডিহাইডের দ্রবণের সঙ্গে ২ সিসি ফিনাইল হাইড্রোজাইন হাইড্রোকোরাইড (১%) এবং ১ সিসি ৫% পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাড দিয়ে তারপর ৫ সিসি ঘনীভূত হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড মেশালে পুরো দ্রবণ গাঢ় গোলাপী রঙ হয়ে থাকে।

দুধের বেলায় ঃ একটি টেস্ট টিউবে ১০ এম এল দুধ নিয়ে তাথে ৫এম এল সালফিউরিক এসিড ও ফেরিক ক্লোরাইডের মিশিয়ে একটু নড়া চড়া করলে যদি নীল-লোহিত বর্ণের রিং তৈরি করে তা হলে বুজতে হবে এতে ফরমালিন মিশ্রিত আছে (Take 10 ml of milk in test tube and 5 ml of conc. sulphuric acid is added on the sides of the test tube with out shaking. If a violet or blue ring appears at the intersection of the two layers, then it shows the presence of formalin) তবে গুড়া দুধের বেলায় ধরা খুভ কস্টকর বিশেষ করে মেলানিন সহ কেমিক্যাল পদার্থের । কথিত আছে বড় বড় খামার বাড়ির কর্তারা প্যাকেট জাত দুধ উৎপাদন কারীর কাছে পৌছে দেয়ার আগে, দুধে কয়েক ফোটা ফরমালিন মিশ্রিত করে নেয় যা ” খামারীর ফোটা ” নামে অনেকেই জানেন মুলত ইহাই ফরমালিন অথচ এই দুধ খেয়ে ছোট ছোট কোমলমতী বাচ্চারা অবসন্নতা ও মেধা শূন্যতায় ভুগতে পারে সে কথা মনে রাখা উচিৎ ।

(যদিও বৈজ্ঞানিক ভাবে ১০০% নিশ্চিত নয় তার পর ও গড়ে ৬০% ফরমালিন মুক্ত থাকা সম্ভব কেননা পরীক্ষায় দেখা যায় ফরমালিন মিশ্রত পন্য এক ঘন্টা পানিতে ডুবিয়ে রাখলে সর্বোচ ০.০৫ পিপিএম পরিমাণ কমতে পারে। যেখানে মাছে ফরমালিনের মাত্রা ০.৫-৫.০ পিপিএম দেখা যায় তখন কত টুকু ফরমালিন মুক্ত হবে বুজতেই পারছেন !)

ফরমালিন দূর করতে হলে যা যা করতে পারেন ঃ (সংগৃহীত) পরীক্ষায় দেখা গেছে পানিতে প্রায় ১ ঘন্টা মাছ ভিজিয়ে রাখলে ফর্মালিনের মাত্রা শতকরা ৬১ ভাগ কমে যায়ঃ- লবনাক্ত পানিতে ফর্মালিন দেওয়া মাছ ১ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ফর্মালিনের মাত্রা কমে যায় বলে মনে করা হয় – প্রথমে চাল ধোয়া পানিতে ও পরে সাধারন পানিতে ফর্মালিন যুক্ত মাছ ধুলে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ ফর্মালিন দূর হয় – সবচাইতে ভাল পদ্ধতি হল ভিনেগার ও পানির মিশ্রনে (পানিতে ১০ % আয়তন অনুযায়ী) ১৫ মিনিট মাছ ভিজিয়ে রাখলে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ ফর্মালিনই দূর হয়– এক লিটার পানিতে এক কাপ ভিনেগার মিশিয়ে শাকসবজি, ফলমুল কিংবা মাছ ১৫ মিনিট রাখুন এবং এরপর ধুয়ে নিন ভালো করে এবং এই পদ্ধতি অনেক টা ভাল অন্যান্য পদ্ধতির চাইতে । ঠিক সে ভাবে ফল মুল ও শাঁক সবজির বেলায় ও করতে হবে বলে জানানো হয়েছে ।

(Fruits: If you suspect that the fruit contains formalin, you must sink it under water for at least 1 hour. Then the formalin will be removed and you can eat the fruit.
Vegetables: Vegetables can be ripen by formaldehyde too. You should sink those under salt-water for at least 10 minutes before cooking. It will remove the formalin from the vegetables.
Fishes: Sink the fishes under water for one hour. It will remove 60% formalin. If you sink it under salt-water for one hour, 90% formalin will be removed. If you sink the fishes under vinegar mixed water [90% vinegar, 10% water], 100% formalin removal can be guaranteed!)

কিভাবে কিছু টা সন্দেহ করতে পারেন ফরমালিন যোক্ত মাছ বা সবজি ?

ফরমালিনযুক্ত মাছের ফুলকা ধূসর, চোখ ঘোলাটে ও ফরমালিনের গন্ধ পাওয়া যায়। এছাড়া ফরমালিনযুক্ত মাছে মাছি বসে না। আঁইশ তুলনামূলক ধূসর বর্ণের হয়, শরীরে আঁশটে গন্ধ কম পাওয়া যায়, দেহ তুলনামূলক শক্ত হয়। অন্যদিকে ফরমালিনবিহীন মাছের ফুলকা উজ্জ্বল লাল বর্ণের হয়, চোখ ও আঁইশ উজ্জ্বল হয়, শরীরে আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়, মাছের দেহ নরম হয়, ত্বকের আঁশ পিচ্ছিল থাকে। ফরমালিন যুক্ত ফলে প্রাকৃতিক সুবাসের পরিবর্তে ঝাঁঝালো এক প্রকার গন্ধ থাকে। ফলের বোটার অংশটি নাকের কাছে ধরুন। যদি প্রাকৃতিক গন্ধ না পান বা ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে লাগে তাহলে নিশ্চিত ভাবেই এতে ফরমালিন মেশানো হয়েছে মনে করতে পারেন।

ক্যালসিয়াম কার্বাইড (calcium carbide)

সাধারনত ক্যালসিয়াম কার্বাইড এক ধরনের কেমিক্যাল (Ca C2) ধূসর কালো দানাদার রসুনের গন্ধযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ। ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহার করা হয় ইস্পাত কারখানায়, ধাতব বস্তু কাটাকাটিতে বা ওয়েল্ডিং ইত্যাদি কাজে । অ্যাসিটিলিন গ্যাস তৈরি করার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়, বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরির জন্যও এটি ব্যবহার করা হয় , যার দুটি ফর্মের কার্বন এটম ডাবল ও ট্রিপল এটম বন্ডে রূপান্তরিত করা যায় । তবে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারে ক্যালসিয়াম কার্বাইড এর সঙ্গে আর্সেনিক এবং ফসফরাস মিশ্রিত করে ব্যাবহার করা হয় । অন্য দিকে ইহা পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে ইথিলিন গ্যাস আর চুন তৈরি করে। এই ইথিলিন গ্যাসকে পলিমার বিক্রিয়া করা হলে পলিথিন তৈরি হয় বা বলতে পারেন পলিথিন তৈরির কাঁচামাল ।অন্যদিকে ক্যালসিয়াম ও কার্বন নিয়ে গঠিত পদার্থটিতে দুটি ক্ষতিকারক পদার্থ আর্সেনিক এবং ফসফরাস থাকে । তাই নিঃসন্দেহে মারাত্মক ক্ষতিকারক ইহা কাউকে বলার অপেক্ষা রাখেনা । সদ্য গবেষণায় সকলেই একমত ২১% সম্বাভনা আছে – যকৃৎ, কিডনি ও ফুসফুসের ক্যানসারের ।

কীভাবে ফল কে পাকায় ঃ- ক্যালসিয়াম কার্বাইড জলীয় সংস্পর্শে এলেই অ্যাসিটিলিন গ্যাস নির্গত করে, যা পাকানোর সময় ফলের সাথে মিশে ক্ষতিকর ইথাইলিনে রূপান্তরিত হয়। অ্যাসিটিলিন ইথাইলিনে রূপান্তরিত হয়ে ফল খুব শিগগিরই ফলের কষ ও ঘামের সঙ্গে এ পদার্থ মিশে গ্যাস তাপের সৃষ্টি করার ১২ /১৪ ঘণ্টার ভিতর ফল পাকতে শুরু করে কেউ কেউ সাথে কেরোসিন ব্যাবহার করেন ।

ক্যালসিয়াম কার্বাইড স্বস্থের জন্য কি কি ক্ষতি করেঃ

কেমিক্যাল মিশ্রিত ফল খেলে মানুষ দীর্ঘমেয়াদি নানা রকম রোগে বিশেষ করে বদহজম, পেটের পীড়া, পাতলা পায়খানা, জন্ডিস, গ্যাস্ট্রিক, শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, লিভার ও কিডনি ন্ষট হওয়াসহ ক্যান্সারের মত জাটল রোগের সৃষ্টি হয়। এছাড়া মহিলারা এর প্রভাবে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিতে পারে।– শ্বাসের সঙ্গে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের গ্যাস গ্রহণ করলে তা ফুসফুসের জন্য তিকর। সাধারণত এর ফলে শ্বাসকষ্ট ও কাশি হয়। অতিমাত্রায় গ্রহণ করলে ফুসফুসে পানি জমে তীব্র শ্বাসকষ্ট হতে পারে।–ক্যালসিয়াম কার্বাইড ত্বকের সংস্পর্শে এলে জ্বালা-পোড়া হয় এবং লাল হয়ে ফুলে যেতে পারে।–চোখের সংস্পর্শে এলে চোখেও জ্বালা পোড়া হয় এবং চোখের কর্নিয়া বিনষ্ট হতে পারে।–ক্যালসিয়াম কার্বাইড মুখ, গলা এবং কোমল ঝিলি পর্দায় প্রদাহ সৃষ্টি করে।–ক্যালসিয়াম কার্বাইড থেকে উৎপন্ন অ্যাসিটিলিন গ্যাস অতিমাত্রায় শরীরে প্রবেশ করলে মাথা ঝিমঝিম করে, মাথাব্যথা, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড় করা, ডায়রিয়া, পেটব্যথা, বমিবমিভাব এবং বমি হতে পারে। এমনকি অ্যাসিটিলিন বিষক্রিয়ার ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

কীভাবে বুজবেন ফলকে কার্বাইড দিয়ে পাকানো হয় ?-

ফল দেখতে চেহারা উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় লাগবে ।- ফল সমূহ দেখতে সম্পূর্ণ ফলের রঙ এক ধরনের দেখাবে, অথচ কার্বাইড দিয়ে না পাকালে ফলের গোড়া বা অন্যান্য অংসে সাদা কালো বা কসের দাগ থাকবেই অথবা একটি গাছের ফল কোন সময় সমান ভাবে পাকেনা । টমোটো, আম, পেঁপে ইত্যাদি ফলকে কৃত্রিমভাবে পাকানো হলে ফলত্বক সুষম রঙ ধারণ করে। কলার ক্ষেত্রে ফলত্বক হলুদ বর্ণের থাকলেও কাণ্ডের অংশ গাঢ় সবুজ রঙের থাকে। – ফলের গন্ধ রসুনের মত হালকা গন্ধ থাকতে পারে বা মিস্টি গন্ধ থাকবেনা – অথবা ফল মুখে দিলে দেখবেন টক বা মিষ্টি কোনো স্বাদই নেই বরং বিষাদ, পানসা, শক্ত ও তেতো স্বাদযুক্ত মনে হবে ।

কি পরীক্ষা করতে পারেন ঃ-

কার্বাইডের অস্তিত্ব শনাক্তের জন্য আড়তগুলোর আম ডিস্টিল ওয়াটারে ডুবিয়ে তাতে ক্যালসিয়াম ইনডিকেটর দেওয়া হয়। কার্বাইড দিয়ে পাকানো আম কিছুক্ষণ পর সবুজ রং ধারণ করে।

CATEGORIES চিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যাবস্থাপনা • TAGS ফরমালডিহাইড এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইড (FORMALDEHYDE & CALCIUM CARBIDE)